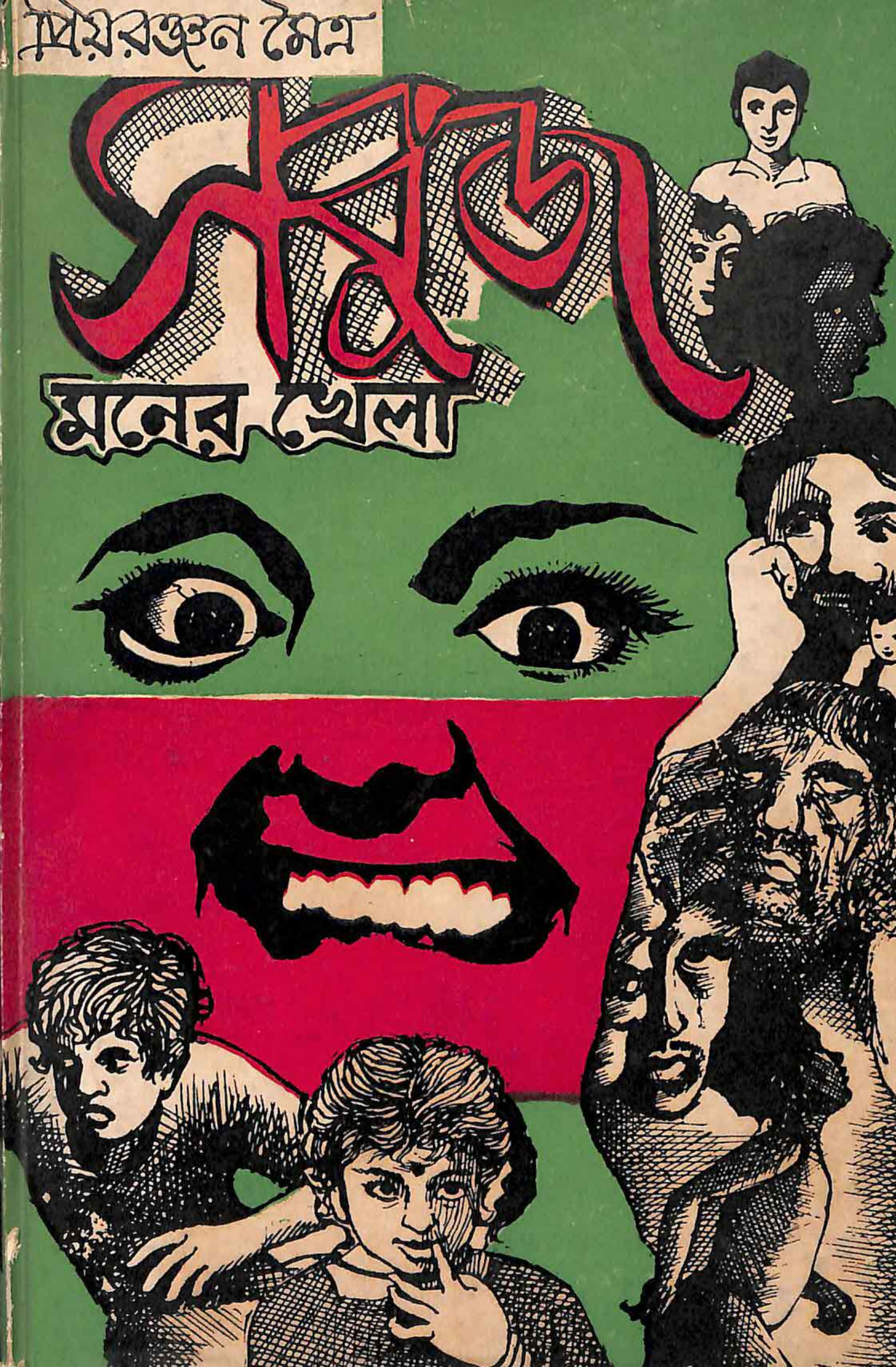

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র
সবুজ
মনের খেলা




প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

[ স্থাপিত ১৯৪০ ]

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৯০

টা. ৮.০০

প্রচ্ছদ ও
অলংকরণ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশন : কনকপ্রভা বসু
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

মুদ্রণ : তাপসী প্রিন্টার্স
লীলা ঘোষ
৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬





যেদিন কোন কারণে বাবা মায়ের কাছে খুব বকুনি খায় লালটু সেদিন হাঁটতে হাঁটতে বাঁধের ওপর চলে আসে সে। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। জেলেপাড়া পিছনে ফেলে, শ্মশান বাঁয়ে রেখে হাঁটতে হাঁটতে সেই অশথতলা।

এই নির্জন অশথতলায় বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা ভাবে লালটু। কখনো ভাবে বাবা মায়ের নিষ্ঠুরতার কথা, কখনো ভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার কথা, আর কখনো ভাবে নিজের খেয়ালিপনার কথা।

লালটুর মাথায় মাঝে মাঝেই বিচিত্র ধরনের খেয়াল চাপে। যেমন জ্যোৎস্না রাতে চুপি চুপি বাগানে গিয়ে গাছেদের কথা বলা, চলাফেরা দেখার খেয়াল ( কোন এক গল্পের বইতে নাকি লেখা আছে রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন গাছেরা একে অপরের কাছে যায়, সুখ-দুঃখের কথা বলে আর খুব ভোরে ফিরে যায় নিজের নিজের জায়গায় ), ভূত দেখার খেয়াল ( পাশের বাড়ির খুড়ীমা বলেছিলেন তাঁদের নিমগাছে নাকি ভূত আছে ), কাকের বাচ্চা পোষার খেয়াল··· এমনি কত কি! বিশেষ করে এইসব খেয়ালিপনার জন্যই বাবা মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয় লালটুকে।

বকুনি খাবার পর লালটু যতই ভাবে এখন থেকে সে ভাল হয়ে চলবে, খেয়ালের বশে আজেবাজে কিছু করবে না—ততই যেন খেয়ালের পোকাগুলো ঘুরঘুর করতে থাকে তার মাথার মধ্যে।

তবু সেদিন লালটু নিজের মাথাতেই হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করল আর নয়, আজ থেকে সত্যিই সে ভাল ছেলে হবে। রীতিমত গুড্ বয়। গুড্ বয় বলতে সবদিক থেকেই। স্কুলে সে তো বরাবরই

ভাল ছেলে। তাই স্কুলে ঝামেলা নেই। ঝামেলা যত বাইরে। ওই খেয়ালিপনা নিয়ে।

প্রতিজ্ঞা ট্রতিজ্ঞা করে বাড়ি ফিরে লালটু দেখল মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে গয়লাখুড়োর।

গয়লাখুড়ো বলছে, 'আমি কি করব বলুন মা গরুগুলোই যে পাতলা দুধ দিচ্ছে।'

মা বললেন, 'গরু পাতলা দুধ দিচ্ছে না মোটেই, তুমিই দুধে জল দিচ্ছো।'

মায়ের কথা শুনে জিব্ কাটল গয়লাখুড়ো। বলল, 'এ কথা বলবেন না মা। আপনার বাপ-মায়ের দিব্যি আমি দুধে জল দিই না। দুধের খুব টান পড়লে জলে দুধ দিই।'

—সেই তো এক কথাই হল।

—না মা এক কথা নয়। দুধে জল দেওয়া আর জলে দুধ দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। সে আপনি বুঝবেন না মা। তবে আপনাদের যে দুধ দিই সে দুধ খাঁটিরও খাঁটি। এত খাঁটি যে কি বলব—

গয়লাখুঁড়ো যে মিথ্যে বলছে জানে লালটু। একদিন তো সে নিজেই রাস্তার কল থেকে দুধে জল দিতে দেখেছে গয়লাখুড়োকে।

গয়লাখুড়ো চলে যাবার পরেও গজগজ করতে লাগলেন লালটুর মা।

বারান্দায় বসে মায়ের গজগজানি শুনতে শুনতে লালটুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ভুলে গেল তার প্রতিজ্ঞার কথা।

পরদিন গয়লাখুড়ো আর দুধ নিয়ে এল না। জানিয়ে গেল বাছুরে সব দুধ খেয়ে নিয়েছে।

তারপর দিনও এসে একই কথা বল্‌ল সে।

লালটুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বাছুর বেঁধে রাখ না?'

গয়লাখুড়ো বলল, 'বেঁধে মানে! একেবারে নাইলনের দড়ি

দিয়ে বেঁধে রাখি মা। কিন্তু কী করে যে খুলে ফেলছে বুঝতে পারছি না।'

লালটুর ঠাকুমা বললেন, 'তুমি দুধে জল দিয়ে যে পাপ করছো সেই পাপ ঠাকুর সইতে পারছেন না, তাই তোমায় শাস্তি দিচ্ছেন।'

গয়লাখুড়ো বলল, 'না ঠাক্‌মা তা নয়। দুধে জল না দিয়ে গয়লার ধম্ম মানছি না বলেই ঠাকুর শাস্তি দিচ্ছেন আমায়।'

এতক্ষণ সকলের কথা শুনছিল লালটু। এবার সে বলল, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানো গয়লাখুড়ো—মনে হচ্ছে তোমার গরুর বাছুররা দড়ি খুলতে শিখে গেছে।'

গয়লাখুড়ো হেসে বলল, 'তুমি কী যে বল দাদাবাবু! গরুর বাছুরে দড়ি খুলবে কি করে?'

পরপর তিনদিন দুধ দিতে পারল না গয়লাখুড়ো।

চতুর্থ দিন রাত্রে গয়লাপাড়া থেকে একটা হৈ-হৈ শব্দ ভেসে এলো। এবং দেখা গেল কয়েকজন লোক কাকে যেন তাড়া করে আসছে লালটুদেরই বাড়ির দিকে।

কিন্তু যাকে তাড়া করা হয়েছিল সে লালটুদের বাড়ির পেছন দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল বুঝতে পারল না কেউ।

লালটুর বাবা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন কে একজন নাকি ঢুকেছিল গয়লাখুড়োর গোয়ালে। সে জানত না আজ নিজে পাহারা দিচ্ছিল গয়লাখুড়ো।

অন্ধকারে তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল গয়লাখুড়ো। কিন্তু এক থাবড়া গোবরই সব গোলমাল করে দিল। গোবরটা একেবারে গয়লাখুড়োর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল পাজীটা। আর একটু হলে চোখদুটোই নষ্ট হয়ে যেত গয়লাখুড়োর।

লালটুর বাবা বললেন, 'লোকটাকে চিনতে পারনি?'

গয়লাখুড়ো সঙ্গীদের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'অন্ধকারে

ঠিক চিনতে পারি নি। তবে এরপর যেদিন আসবে সেদিন ঠিক ধরে ফেলব।'

লালটুর বাবার কী যেন সন্দেহ হল এত হৈ-চৈ কথাবার্তার মধ্যে লালটুর ঘুম না ভাঙার কথা নয়।

গয়লারা চলে যাবার পর লালটুর ঠাকুমাকে লালটুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'লালটু কি ঘুমোচ্ছে?'

লালটু ইদানীং ঠাকুমার ঘরে শুচ্ছিল।

ঠাকুমা ঘুম ভাঙতেই দেখেছিলেন লালটু বিছানায় নেই। কিন্তু এতক্ষণ সে কথা বলেন নি তিনি। লালটুর বাবা যখন জানতে চাইলেন তখন আর না বলে পারলেন না। বললেন, 'ওকে তো বিছানায় দেখছি না।'

লালটুর বাবা বললেন, 'এ ওই শয়তানটারই কাজ। গয়লাখুড়ো ঠিক চিনতে পেরেছে তবে বলতে সাহস পেল না। অতটুকু ছেলে ভয় ডর বলে কিছু নেই। তোমার আস্কারা পেয়েই ছেলেটা বাঁদর হচ্ছে দিনের পর দিন।

লালটুর ঠাকুমার ওপর দোষারোপ করলেন লালটুর বাবা।

লালটুর ঠাকুমা বললেন, 'ত্যাখ্, বাজে কথা বলিস না। ছেলেটা আর যাই করুক কারো অনিষ্ট করে না। শুধু একটু খেয়ালী—এই যা।'

'—হুঁ; খেয়ালী। আগের জন্মে ও ঠিক চোর টোর ছিল। নইলে রাতে রাতে ঘুরে বেড়ায়, প্রাণের ভয় নেই। তুমি দেখো এ ওই শয়তানটারই কাজ।'

লালটুর বাবার ধারণা যে ভুল নয় প্রমাণ হল একটু পরেই।

রাস্তা বাগান ঘুরে কোথাও লালটুকে না পেয়ে লালটুর বাবা লালটুর ঠাকুমাকে বললেন, 'আজ ওকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। বাইরে থাক, মশার কামড় খাক।'

এই কথা বলে তিনি ঘরে যাবার একটু পরেই উঠোনের স্তূপীকৃত

খড়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এলো লালটু। তখনো তার হাতে পায়ে গোবর লেগে রয়েছে। গোবর লেগে রয়েছে জামা-প্যান্টেও।

—লালটু—

অন্ধকার বারান্দায় পা দিতেই বাবার গম্ভীর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল লালটু।

বাইরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন লালটুর মা। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন লালটুর ঠাকুমাও।

—কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? জিজ্ঞেস করলেন লালটুর বাবা। মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লালটু।

—বলবি না কোথায় ছিলি? এবার গলায় বেশ জোর দিলেন লালটুর বাবা।

লালটুর ঠাকুমা বললেন, 'বল্‌না কোথায় ছিলি?'

লালটুর মা বললেন, 'কোথায় ছিলি বল্‌না সত্যি করে।'

এতক্ষণে মুখ নীচু করেই আস্তে আস্তে লালটু বলল, 'খড়ের গাদায়।'

—তার আগে? আবার প্রশ্ন করলেন লালটুর বাবা।

ঢোক গিলল লালটু। বলল, 'গয়লাখুড়োর গোয়ালে।'

লালটুর মা বললেন, 'তবে কি তুই-ই গয়লাখুড়োর গরুর বাছুরের দড়ি খুলে দিস! কিন্তু কেন?'

এবার মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল লালটু। বলল, 'গয়লাখুড়ো দুধে জল দেয় কেন? গরুর বাছুরকে না খাইয়ে মেরে ফেলে কেন?'

—তাতে তোর কি? পাজী, শয়তান—তেড়ে গিয়ে লালটুকে সজোরে একটা চড় কষালেন লালটুর বাবা। তবে আর একটা চড় মারবার আগেই লালটুকে আড়াল করলেন লালটুর মা।

লালটুর বাবা বললেন, 'নাক খৎ দে। বল আর কোনদিন কাউকে না জানিয়ে রাতে বাড়ির বাইরে যাবি না—দে, নাক খৎ দে—'

সেদিনের ঘটনার পর ক'দিন চুপচাপ রইল লালটু। সকালে পড়া, তারপর স্কুল, স্কুল থেকে বাড়ি, বিকেলে বাঁধের ওপর, অশথতলা, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে পড়তে বসা, তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুম। যেন রুটিন মাফিক দিন কাটতে লাগল লালটুর।

নিশ্চিন্ত হলেন লালটুর ঠাকুমা, ভাবলেন নাতির সুবুদ্ধি হয়েছে।

এরপর এল শিবচতুর্দশী।

সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল লালটুর।

উঠে বসল সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বিছানার ওপর।

ঘুমন্ত ঠাকুমার বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল আজ শিবরাত্রি। মা সারাদিন উপোস ছিলেন। সন্ধ্যের সময় বুড়ো শিবতলায় পূজো দিয়ে এসে প্রসাদ নিয়েছেন।

বুড়ো শিবতলার কথা মনে হতেই লালটুর চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্যালেণ্ডারের ছবিটা। মাথায় জটা, গলায় সাপ জড়ানো অর্ধনিমীলিত চক্ষু দেবাদিদেব মহাদেব বসে রয়েছেন। আর তাঁর তু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর তুই অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী। অদ্ভুত রোগা লিকলিকে চেহারা তাদের।

লালটুদের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে দক্ষিণ পাড়া। দক্ষিণ পাড়ার শেষে জংলার ধারে প্রাচীন শিবমন্দির। ওই শিবমন্দিরকেই লোকে বলে বুড়ো শিবতলা। অনেক দিন আগে কোন এক সাধু নাকি এই শিব মন্দির গড়েছিলেন। সন্ধ্যের পর ওদিকে বিশেষ কেউ যায় না। লালটুর ঠাকুমা বলেন মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে স্বয়ং মহাদেব তাঁর তুই অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ থেকে অদৃশ্য রথে চড়ে ওই বুড়ো শিবতলায় আসেন। সেই সময় লোকজন থাকলে তিনি নাকি বিরক্ত হন। এক কালের জমিদার নৃসিংহ রায় এসব কথা বিশ্বাস না করে একদিন রাত্রে বুড়ো শিবতলায় গিয়েছিলেন

বলেই মহাদেবের সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আর বুড়ো শিবতলার গায়েই যে বিরাট বেলগাছটা সেই গাছেই না কি ভূত প্রেতের বাস। অনেকেই দেখেছে তাঁদের। তবে ঠাকুমা নিজে দেখেন নি।

লালটুর বাবা-মা-ঠাকুমা সকলেই নিষেধ করে দিয়েছেন লালটুকে সে যেন ভুলেও কোন দিন সন্ধ্যের পর বুড়ো শিবতলায় না যায়।

কিন্তু লালটুর অনেকদিনের ইচ্ছে একদিন দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে দেখা করে একটা বর চেয়ে নেয়। বরটা হচ্ছে সে যখন যা ভাববে তাই যেন করতে পারে।

লালটু ভাবল আজ শিবরাত্রি। আজ মহাদেব নিশ্চয়ই বুড়ো শিবতলায় এসেছেন। এখন গেলে নিশ্চয়ই তাঁর দেখা মিলবে। তিনি আর যার ওপরেই বিরক্ত হোন লালটুর মতো ছোট ছেলেকে দেখে নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন না।

খাট থেকে নেমে পড়ল লালটু। নিঃশব্দে দরজার খিল খুলল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সদর দরজা পেরিয়ে হাঁটতে লাগল হন্‌হন্ করে।

পোস্ট অফিস পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলো রয়েছে। ওটুকু যেতে অসুবিধে হল না। কিন্তু তারপর কাঁচা রাস্তা। অমাবস্যার অন্ধকার।

অন্ধকারে চলতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেল লালটু। তবু থামল না। একটা শেয়াল ডানদিক থেকে বাঁদিকে রাস্তা পেরুলো।

শেয়াল কোন দিক থেকে কোন দিকে গেলে যে যাত্রা শুভ হয় এই মুহূর্তে ভেবে পেল না লালটু।

জংলার পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল মন্দিরের সামনের বাঁধানো যজ্ঞকুণ্ডটায় আগুন জ্বলছে। সেই কুণ্ডের পাশে বসে রয়েছে তিনটি ছায়ামূর্তি।

বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল লালটুর।

এক মুহূর্তে অনেকগুলো কথা ভাবল সে।

···যদি সত্যিই মহাদেব আর নন্দী-ভৃঙ্গী হন তবে কি আমাকে দেখে বিরক্ত হবেন ? আচ্ছা, ওঁরা কোন ভাষায় কথা বলেন—বাংলা, হিন্দী না সংস্কৃত ? সংস্কৃতকেই নাকি দেবভাষা বলে। তবে সংস্কৃতে কথা বলাই স্বাভাবিক। আমি যা সংস্কৃত শিখেছি তাতে কি ওদের কথা বুঝতে পারব ! যদি আস্তে আস্তে বলেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারব···



বড় করে একটা নিঃশ্বাস টেনে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল লালটু। ক্লাস সেভেনে সংস্কৃতে সে পঁচাত্তর পেয়েছিল। অতএব সংস্কৃত কথা বুঝতে না পারার কারণ খুঁজে পেল না সে।

—জয় বাবা বিশ্বনাথ—তিনটি ছায়ামূর্তির একটি চিৎকার করে উঠল।

চমকে উঠল লালটু। 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' কথাটির মধ্যে সংস্কৃতর অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে নিশ্চিন্তও হল সে।

পায়ে পায়ে কিছুটা এগিয়ে গেল লালটু।

এবার দেখল খুব রোগা একজন গাঁজার কল্কেতে টান মারছে। তার হাত থেকে আর একজন নিল কল্কেটা। সেও রোগা। তারপর আর একজন নিল। সে খুব মোটাসোটা।

তাহলে রোগা দুজন নিশ্চয়ই নন্দী-ভৃঙ্গী হবে। আর মোটাসোটা বোধ হয় মহাদেব। ভাবল লালটু।

কিন্তু মহাদেবের মাথায় জটা কৈ? তবে কি জটায় উকুন হয়েছিল তাই কেটে ফেলেছেন মহাদেব? কিন্তু গায়ে জামা রয়েছে যেন। স্বর্গে কি জামা-কাপড় তৈরী হচ্ছে আজকাল? কিন্তু ছবিতে মহাদেব খালি গায়ে বাঘছাল পরে রয়েছেন যে! তবে?

পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে গেল লালটু।

উঃ, কী বিচ্ছিরি গন্ধ।

'বিচ্ছিরি' কথাটা ভেবেই জিব্ কাটল লালটু। দেবতাদের জিনিসকে বিচ্ছিরি ভাবা ঠিক না। যদি মহাদেব মনের কথা জানতে পারেন তবে হয়তো এমন অভিশাপ দেবেন লালটুকে যে লালটু হয়তো গরু-গাধা বনে যাবে।

...আর কি এগোনো ঠিক হবে? না, এসেইছি যখন মহাদেবের কাছ থেকে বরটা নিয়েই যাই। বরটা যদি পাই তাহলে সবাইকে চমকে দেব। চমকে দেব অঙ্কের স্যার ভুজঙ্গবাবুকেও। তাঁর গাঁট্টা মারা একদম বন্ধ করে দেব...

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আরো এগিয়ে গেল লালটু। এবং যজ্ঞ কুণ্ডটার কাছাকাছি পৌঁছে ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠেই পিছন ফিরল সে।

তারপর অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতে যখন বাড়ি পৌঁছুলো তখন ঘেমে স্নান করে গেছে।

বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ হাঁপাল সে। তারপর ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ।

লালটু বুঝল ঠাকুমা উঠে খোঁজাখুঁজি করে তাকে না পেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন।

—ঠাক্‌মা—ঠাক্‌মা—

এমন চাপাস্বরে ডাকল লালটু যাতে পাশের ঘরে বাবা-মায়ের কানে না যায় শব্দটা।

—ঠাক্‌মা—ঠাক্‌মা—

আবার ডাকল লালটু।

টিক্ করে একটা শব্দ হল। ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল। দরজা খুলে গেল।

ঠাকুমা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়া তোর বাবাকে আগে ডাকি।'

—কেন ঠাক্‌মা?

—সেটা তোর বাবাকে ডাকলেই টের পাবি। এই সেদিন নাকে খৎ দিলি, আজ আবার রাতে বেরিয়েছিস! দাঁড়া—

ঠাকুমার গলা চড়ে যাচ্ছে দেখে ঠাকুমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল লালটু। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

ঠাকুমা নাক মুখ কুঁচকে বললেন, 'এঁ-হেঁ-হেঁ ছুঁয়ে দিলি, অ্যা- এই রাতেও আমাকে চান করিয়ে ছাড়বি তুই? কোন্ আদাড়-পাদাড় ঘুরে এসে শেষে কিনা আমায় ছুঁলি? ইস্-স্-স্ আচার-বিচের আর কিছু রাখলে না ছেলেটা।

লালটুর ঠাকুমার ছুঁই ছুঁই বাই আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনি যে কতবার স্নান করেন তার ঠিক নেই। ওঁর ভয় কখন কি নোংরা মাড়িয়ে অপবিত্র হয়ে যান।

লালটু বলল, ঠাক্‌মা অত চেঁচিয়ো না। বাবা-মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

লালটুর ঠাকুমা বললেন, 'আমি তো চাই ওদের ঘুম ভাঙুক। তাদের গুণধর পুত্রের রকম-সকম দেখুক।'

—বেশ, তবে তুমি চেঁচাও। তারপর বাবা উঠে আমাকে মারুক বকুক। তাতে আমার কি! তোমারই পাপ বাড়বে।

—আমার পাপ বাড়বে কেন?

—আজ যে আমি কোন অন্যায় করি নি। বুড়ো শিবতলায় গেছিলাম মহাদেবকে দেখতে।

—বুড়ো শিবতলায় এত রাতে তুই গিয়েছিলি! অবাক হলেন ঠাকুমা।

—রাতে না গেলে মহাদেবকে দেখব কি করে? তিনি তো রাতেই আসেন। তাই এখন গিয়ে তাঁকে দেখে এলাম।

—দেখে এলাম মানে?

—আজ উনি এসেছিলেন ঠাক্‌মা।

—তুই সত্যি দেখেচিস তাঁকে?

—হ্যাঁ ঠাক্‌মা। নন্দী-ভৃঙ্গীকেও দেখেছি।

লালটুর কথা শুনে ধপ করে বসে পড়লেন ঠাকুমা। লালটুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন।

—কি দেখেচিস তুই? ঠাকুরকে সত্যিই দেখেচিস? আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।—বল না বাবা কেমন দেখলি তাঁকে?

এবার ঢোক গিলল লালটু। একটু ভাবল। ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর চোখ দুটো বড় করে বলল, 'তাঁকে মনে হতে আমার শরীরের ভেতরটা এখনো শিরশির করছে। ছাখ, ছাখ আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিচ্ছে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করছে ঠাক্‌মা—'

ঠাকুমা বললেন, 'থাক বাছা থাক। এখন কিছু বলতে হবে না, কাল সকালে বরং বলিস। এখন শুয়ে পড়।'

হাতজোড় করে কপালে ছোঁয়ালেন ঠাকুমা। বিড়বিড় করে কা

যেন বললেন। উঠে গিয়ে কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন লালটুর গায়ে। তারপর লালটুর পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সকালে উঠে ঠাকুমাকে কি বলবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল লালটু।

সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। লালটুর বাবা জেলা সদরে কাজ করেন। উনি ট্রেন ধরতে বেরিয়ে গেছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল লালটু।

জামাটা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরুতে যাবে এমন সময় সে শুনতে পেল ঠাকুমা বলছেন, 'আমি জানতুম এ ছেলে কিছু হবে। যে ছেলে খেয়ালী হয় সে আর পাঁচজনের মতো হয় না।'

—শুনেছি রামকৃষ্ণও নাকি অমনিই ছিলেন ছেলেবেলায়। ঠাকুর-ঠাকুর খেলতেন। সঙ্গীদের নিয়ে কল্পতরু হতেন।

—গতবারে ওদের স্কুলের থিয়েটারে ও যখন বিবেকানন্দ সেজেছিল তখনই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল।

দরজার পাশ থেকে লালটু উঁকি দিয়ে দেখল বারান্দা জুড়ে বসে রয়েছেন ঠাকুমা, নিতাইয়ের পিসী, মিষ্টি জেঠিমা আরো কে কে যেন। ওঁরাই সব কথা বলছেন।

ওর বুঝতে বাকি রইল না ঠাকুমাই তার শিব ঠাকুর দর্শনের সংবাদ জানিয়েছে এ বাড়ি ও বাড়ি। তাই তার মুখ থেকে সব শুনবে বলে ভিড় জমেছে বুড়ীদের।

একটু ভাবল লালটু। তারপর বেরুলো ঘর থেকে। গম্ভীর মুখে কুয়োতলায় গিয়ে হাত-মুখ ধুলো।

রান্নাঘর থেকে মা ডাকলেন, 'লালটু, একটু কিছু মুখে দিয়ে যা বাবা, অনেক বেলা হয়েছে।'

ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকে মিষ্টি দিতে ভুলো না বৌমা।'

লালটুর মনে হল মা-ঠাকুমার গলাটাও যেন আজ খুব মিষ্টি।

রান্নাঘরে গিয়ে তো অবাক লালটু।

একটা বড় আসন পাতা রয়েছে। সেই আসনের সামনে মায়ের বিয়ের সেই বড় থালাটা। তাতে অনেক রকমের মিষ্টি, লুচি··· কত কি!

—এগুলো কার জন্য? জিজ্ঞেস করল লালটু।

মা বললেন, 'তোর জন্যে। তোর ঠাকুমা, মিষ্টি জেঠিমা, নিতাইয়ের পিসী মিষ্টিগুলো এনেছেন। আমি গরম লুচি ভেজে দিচ্ছি—খেয়ে নে বাবা।'

অন্যদিন সকালে লালটু মুড়ি অথবা রুটি খায়। অবশ্য কোন কোন দিন বাবা জিলিপি আনেন অষ্টা ঘোষের দোকান থেকে। কিন্তু সে কালেভদ্রে। কিন্তু আজ—

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল লালটু।

ঠিক সেই সময় বুড়ীর দল এসে দাঁড়াল দোর গোড়ায়।

মিষ্টি জেঠিমা বললেন, 'তোমাকে সব খেতে হবে বাবা। একটুও ফেলা চলবে না। খাওয়া-দাওয়া করে ঠাণ্ডা হয়ে বসে কাল রাতের ঘটনা আমাদের বলবে।'

মিষ্টি জেঠিমার কথায় সায় দিল সকলে।

সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে খেতে বসল লালটু।

খেতে খেতে শুনতে পেল নিতাইয়ের পিসী ফিসফিসিয়ে বলছেন, 'আজ যেন ওকে নতুন লাগছে। 'বামা ক্ষ্যাপা' নামে যে সিনেমাটা দেখেছিলাম তাতে বামা ঠাকুরও ঠিক অমনি করেই খেয়েছিলেন। ও যেন ছেলেবেলার বামা ঠাকুর।'

বিষম খেল লালটু।

সঙ্গে সঙ্গে যেন সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তার ওপরে। সকলে মিলে ফুঁ দিতে লাগলেন মাথায়।

ঠাকুমা ছুঁই-ছুঁই ভুলে গিয়ে জলের গ্লাশটা লালটুর মুখের কাছে তুলে ধরলেন।

লালটুর মা বললেন, 'যাট-যাট'।

খাওয়া-দাওয়ার পর লালটুকে ঘিরে বারান্দায় বসল সকলে।

চোখ দুটো বন্ধ করে লালটু ভাবল কিছুক্ষণ।

চোখ বোজা অবস্থাতেই সে শুনতে পেল মা বলছেন, 'ছেলে আমার রামকৃষ্ণর মতো সমাধিস্থ হয়ে যাবে না তো?'

ঠাকুমা বললেন, 'ভগবানকে ডাক বৌমা, ভগবানকে ডাক। এ ছেলেকে তোমরা দু'জনে মিলে ছ্যা-ছ্যা কর, কিন্তু এখন এই হবে তোমাদের গর্ব। এ যে আমাদের বাড়িতে জন্মেছে এ আমাদের সাত জন্মের পুণ্যির ফল।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস টেনে চোখ খুলল লালটু। তারপর শুরু করল রাতের ঘটনা। '...যখন ঘুমোচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকছে আমাকে। উঠে বসলাম বিছানায়। অন্ধকারে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। আবার শুয়ে পড়ব ভাবছি এমন সময় শিব ঠাকুরের কথা মনে এলো। এবার মনে হলো তিনিই আমাকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে গেলাম। দেখি কী ভীষণ অন্ধকার—

মিষ্টি জেঠি বললেন, 'অমাবস্যার রাত অন্ধকার তো হবেই।

নিতাইয়ের পিসি বললেন, 'বাইরের আলোটা জ্বাললে না কেন?

ঠাকুমা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমরা একটু থামো বাছা, আগে শুনতে দাও।'

লালটু বলতে লাগল, '...এবার মনে হল সদর দরজার বাইরে থেকে কে যেন ডাকছে। গম্ভীর তার গলার শব্দ। আমি সদর দরজা খুলে বাইরে গেলাম। না সেখানেও কেউ নেই। হঠাৎ মনে হল অনেক দূরে আবছা অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। বাড়ি ফিরে যে আসব তাও পারলাম না। হাঁটতে লাগলাম। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পড়লাম বুড়ো শিবতলায়। সেখানে গিয়ে দেখি যজ্ঞি কুণ্ড জ্বলছে।

আর যজ্ঞি কুণ্ডুর সামনে বসে রয়েছেন শিব ঠাকুর। তাঁর দু'পাশে আরো দু'জন! বুঝলাম নন্দী-ভৃঙ্গী। শিব ঠাকুর যজ্ঞি কুণ্ডু থেকে একমুঠো ছাই তুলে ছুড়ে দিলেন আমার মাথায়। তারপর হাসতে হাসতে হঠাৎ সবাই মিলিয়ে গেলেন। ওঁরা মিলিয়ে যেতেই যেন আমার জ্ঞান হল। কাঁপতে লাগল শরীরের ভেতরটা। আমি ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম।'

লালটুর বলা শেষ হতেই উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন ঠাকুমা।

তাঁর সঙ্গে যোগ দিল সকলেই।

পরে ঠাকুমা বললেন, 'ধন্য তোর মানব জন্ম।'

মিষ্টি জেঠি বললেন, 'ও মানবরূপী অন্য কিছু।'

লালটুর মা বললেন, 'আমি না বুঝে ওকে কত মেরেছি—বকেছি, জানি না এ পাপের কি হবে—'

নিতাইয়ের পিসি বললেন, 'আমার মন বলছে—ও বড় হয়ে মস্ত বড় সাধক হবে।'

কিন্তু রাতে ফিরে এসে লালটুর বাবা বললেন অন্য কথা।

তিনি বললেন, 'সব বানানো গল্প। কাল সারারাত বুড়ো শিবতলায় গাঁজার আড্ডা ছিল। সে আড্ডায় ছিল রাম ঘোষ, শ্যাম বাগ্‌দি, সিধু কষাই—'

বাবার কথা শুনে গলা শুকিয়ে কাঠ লালটুর। সত্যিই ওদের তিনজনকেই দেখেছিল সে। রাম ঘোষের পেটটা বড় বলে ওকে শিব বানিয়ে এবং শ্যাম বাগ্‌দি আর সিধু কষাইকে নন্দী-ভৃঙ্গী বানিয়ে গল্প বলেছিল সকলকে। আর সিধু কষাইয়ের ভয়েই ছুটে পালিয়ে এসেছিল সে। কারণ একদিন খেয়ালের বশে সিধুর দোকানের পাশে খোঁটায় বাঁধা দুটো পাঁঠার দড়ি খুলে দিয়েছিল লালটু। পরে সেই পাঁঠা দু'টোর একটিকে খুঁজে পেয়েছিল সিধু আর একটিকে পায় নি। দড়িটা কে খুলে দিয়েছিল ঠিক ধরতে না পারলেও সিধু সন্দেহ করেছিল লালটুকে। একদিন সে লালটুকে শুনিয়ে বলেছিল

সুযোগ খুঁজছি ধরব বলে। ঠিক ধরতে পারলে সেই শয়তানটাকেও পাঁঠার মতো কেটে পাঁঠার মাংসের সঙ্গে বিক্রী করে দেব।'

সিধুর ওই কথা শোনার পর থেকে লালটু সিধুর আশ-পাশ দিয়েও হাঁটে না। বলা তো যায় না সত্যি সত্যিই তাই করতে পারে। কষাইদের তো মায়া দয়া নেই।

বুড়ো শিবতলায় সিধুকে দেখেই তাই ছুটে পালিয়ে এসেছিল লালটু।

বাবার ধমক খেয়ে সবই স্বীকার করল সে। তবে মার খেল না হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্টের জন্য। কারণ সেদিনই হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট বেরিয়েছিল লালটুর এবং ভাল নম্বরই পেয়েছিল সে।

ঠাকুমা বললেন, 'তোর পেটে এত দুষ্টু বুদ্ধি! সত্যিই তুই বড় হয়ে ডাকাত হবি।'

লালটুর বাবা বললেন, 'এ তো তোমাকে আমি আগেই বলেছি মা। এ ছেলে আমাদের মুখ পোড়াবে। মান-ইজ্জত ডোবাবে। তখন তুমি আমার ওপর রাগ করেছিলে। আমার কি মনে হচ্ছে জানো—ওকে দূর করে দিই বাড়ি থেকে। ক'দিন আগে নাকে খৎ দিয়েও লজ্জা হলো না। ও যা ভাল বোঝে করুক আর আমি কিচ্ছু বলব না।

—কিন্তু আমি এখন কি করি! সকলে যখন জানবে শিব ঠাকুর দেখার কথা মিথ্যে তখন আমাকে কি বলবে ওরা—

প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করলেন ঠাকুমা।

একটু ভেবে লালটুর বাবা বললেন, 'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। চুপচাপ থাক। আর ও বিষয়ে কেউ কিছু বললে এড়িয়ে যেয়ো।

সব শুনে লালটুর মা কিছুই বললেন না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

পরদিন স্কুলে গেলে লালটুর শিব ঠাকুর দেখা নিয়ে অনেকে

অনেক কথা জানতে চাইল। লালটু অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। আর যে সব প্রশ্নের উত্তর দিল তাও মিথ্যে। এক মিথ্যে ঢাকতে অনেক মিথ্যে বলতে হল তাকে।

শেষে বিরক্ত হয়ে পরের দু'দিন স্কুলেই গেল না সে।

বাড়িতে বসে লেখাপড়া করল। একা-একাই দু'জনের চাল দিয়ে লুডো খেলল। আর বিকেলে বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে সেই নির্জন অশথতলায় বসে ভাবল—কেন এমন মিথ্যে বলল সে, আর কেনই বা এমন অদ্ভুত খেয়াল চাপে তার মাথায়!

দু'দিন ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নতুন নতুন করে ভাবল বটে, কিন্তু কূল-কিনারা পেল না।

এরপর একদিন বিকেলে তাদের খেলার জায়গা নতুন পার্কটায় এসে উপস্থিত হল লালটু।

বন্ধুরা ঘিরে ধরল ওকে।

বন্ধু বলতে ফুচকা, হেবো, ফ্যালা, ল্যাঠা, শান্টু।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা (ফুচকার মুদ্রাদোষ কথায় কথায় 'ধ্যুৎ কালা' বলা) হ্যাঁরে লালটু, তুই কি সত্যিই সাধু-সন্নিসী হবি?'

—কেন রে? জিজ্ঞেস করল লালটু।

—মা বলছিল বাবা নাকি বলেছে তোর সাধু-সন্নিসী হওয়ার যোগ আছে। তাই তুই শিব-দর্শন পেয়েছিস।

ফুচকার বাবা জ্যোতিষ চর্চা করেন। উনি নাকি কপালের ভাঁজ দেখেই ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন।

লালটু তাচ্ছিল্যভরে শুধু বলল, 'ভ্যাট।'

হেবো বলল, 'এখন ভ্যাট্ বলচিস বটে হতেও তো পারিস। তখন আমাদের চিনতে পারবি তো?'

ফ্যালা বলল, 'আমি যদি সাধু-টাধু হতে পারতাম খুব ভাল হতো। লেখাপড়ার ঝামেলা, মাষ্টার মশায়ের রাম চিম্‌টি, বাবার বকুনি—সবার হাত থেকে রেহাই হতো।'

ল্যাঠার তোতলামিটা ইদানিং বেড়ে গেছে। সে বলল, 'আ-আ-আমারও খুব সাধু স-স-সন্নিসী হতে ইচ্ছে করে। বেশ সবাইকে আশীর্বাদ করব। অঙ্ক কষতে হবে না।'

শান্টু বলল, 'তুই যদি সন্নিসী হোস, আমিও সন্নিসী হবো। আর আমার এই কালো চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নাম নেব যমদূতানন্দ স্বামী।

শান্টুর কথায় হেসে উঠল সকলে।

হাসি থামলে ফুচকা বলল, 'হা-ডু-ডু খেলবি ?'

লালটু বলল, 'লেখাপড়া, খেলা আর বাড়িতে গিয়ে বকুনি খাওয়া ভাল্ লাগে না। তার চাইতে আয় আমরা সকলে মিলে এমন কিছু করি যাতে সকলে আমাদের ভালবাসে।'

—কি করবি ? জিজ্ঞেস করল শান্টু।

—আমরা ক'জন মিলে একটা সংঘ করব। যে সংঘ সকলের উপকার করবে। আমাদের কেউ ডাকুক না ডাকুক, আমাদের সাহায্য চাক বা না চাক, আমরা নিজেরা এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করব, উপকার করব।

লালটুর প্ল্যানটা মন্দ লাগল না সকলের। সংঘের ঘর কোথায় পাওয়া যাবে, কি নাম হবে··ভাবতে লাগল সকলে।

ল্যাঠা বলল, 'না-না-নাম হবে উপকারী সংঘ।'

নামটা ঠিক পছন্দ হল না শান্টুর।

শেষ পর্যন্ত হেবো ছুটল তার বাবার বাংলা ডিকশানারি আনতে

ফুচকা গেল পিচবোর্ড বা চাটাইয়ের খোঁজে।

কিছুক্ষণ পরেই এক এক করে ফিরে এলো সকলে।

ডিকশানারি খুঁজে নাম ঠিক হল। হিতকারী সংঘ।

লালটু পড়াশুনায় ভাল, ভবিষ্যতে সাধু-সন্নিসীও হতে পারে, তাছাড়া সে যখন নিজে প্ল্যানটা দিয়েছে তখন ঠিক হল সে-ই হবে

সংঘের লীডার। আর ডেপুটি লীডার হবে শান্টু। কারণ সকলের চাইতে ওর গায়ে জোর বেশী।

তিন-তিনটে খবরের কাগজ নষ্ট করে মায়ের আলতা-তুলি দিয়ে ফ্যালা লিখল, 'হিতকারী সংঘ'।

লেখা হলো, লাগানোও হল একটা চাটাইয়ের ওপর—কিন্তু টাঙানো হবে কোথায়? সংঘের ঘর নেই। সংঘ সভ্যদের কারো বাড়িতে একখানা ঘরও খালি নেই।

ভেবে-চিন্তে পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছটা দেখিয়ে শান্টু বলল, ওরই একটা ডালে এখন টাঙিয়ে দে। এমনভাবে টাঙাবি যাতে রাস্তা থেকেও সবাই দেখতে পায়।'

তরতর করে গাছে উঠে গেল হেবো। লেখাটা টাঙিয়ে দিল কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে।

লালটু বলল, 'সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের উচিৎ কারো না কারো উপকার করা।'

কিন্তু কার উপকার দরকার ভেবে পেল না ওরা।

তখন পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল সকলে।

একটু এগোতেই ওদের চোখে পড়ল গগন ধোপা গাধার পিঠে বড় ছুটো বস্তা চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রোগা গাধাটা মালের ভার বইতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে।

গগন ধোপা রেগে গিয়ে কী যেন বলল গাধাটাকে। তারপর তাকে পিটতে লাগল লাঠি দিয়ে।

গাধাটা চিৎকার করল কয়েকবার। তারপর কিছুটা হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল।

গগন আবার পিটতে লাগল।

এবারও গাধাটা কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘটনাটা দেখে লালটু বলল, 'হে হিতকারী সংঘের সভ্যবৃন্দ, আজ আমরা গাধা এবং গগন ধোপার উপকার করব। সবাই রাজী?'

রাজী, রাজী—

চিৎকার করে বলল সকলে।

এগিয়ে গেল ওরা। ঘিরে দাঁড়াল গগন আর তার গাধাকে।

লালটু বলল, 'ওর পিঠে অত মাল চাপিয়েছ কেন ধোপাদা? ও রোগা মানুষ—থুড়ি, মানুষ নয় গাধা। ও কি অত ভার বইতে পারে?'

গগন বলল, 'কী করব খোকাবাবু, আমি বুড়ো মানুষ, আমি যে বইতে পারি না।'

শান্টু বলল, 'ঠিক আছে, আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

—সে কি হয় খোকাবাবুরা, যার যা কাজ তারই করা উচিৎ। তাছাড়া তোমরা এত ভার বইতে পারবে কেন?

—তোমার কোন চিন্তা নেই ধোপাদা, আমরা সবাই মিলে বয়ে নিয়ে যাব। বলতে বলতে বস্তার দড়ি খুলতে লাগল শান্টু।

গগন এই শান্টু ছেলেটাকে ভাল করেই জানে। বড্ড একরোখা ছেলে। ওর ভয় হলো, পুরোনো ধানের বস্তা যদি টানাটানিতে ছিঁড়ে যায় তবে একেবারে যা-তা কাণ্ড হয়ে যাবে।

গগন বাধা দেবার আগেই হিতকারী সংঘের সভ্যরা গাধার পিঠ থেকে টেনে নামাল বস্তাদুটো।

গাধাটাকে হ্যাট্ হ্যাট্ করে তাড়া মারল হেবো।

ভার মুক্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে পালাল গাধাটা।

গগন বলল, 'থাক থাক, তোমাদের বইতে হবে না। বরং আমার মাথায় চাপিয়ে দাও।'

প্রবল আপত্তি জানাল হিতকারী সংঘের সভ্যরা।

কিন্তু বস্তা ছিঁড়ে যাবার ভয়ে কিছুতেই রাজি হল না গগন।

কী আর করা! অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা দুটো বস্তাই চাপিয়ে দিল গগনের মাথায়।

পরদিন সকালে যখন পড়তে বসেছে লালটু তখন হঠাৎ কোকিলের ডাক শুনতে পেল।

অসময়ে কোকিলের ডাক। অর্থাৎ ফুচকা ডাকছে। ওর ডাকার ওইটাই কায়দা। বাড়ির অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।

জানালা দিয়ে লালটু দেখল রাস্তার ওপারে কলাবাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে শান্টু, ফুচকা, ল্যাঠা, হেবো, ফ্যালা। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে গামছা।

এত সকালে সকলের হাতে গামছা কেন ভেবে পেল না লালটু। তবে কি সকলে মিলে নদীতে নাইতে যাবে? না, তা হতে পারে না। অন্য কোন ব্যাপার আছে। ভাবল লালটু।

ইঙ্গিতে কী যেন বলল শান্টু। বুঝতে পারল না লালটু।

এদিক ওদিক তাকিয়ে গামছাটা টেনে নিয়ে এক লাফে উঠোনটা পেরিয়ে গেল সে। পৌঁছুলো কলা বাগানে।

শান্টু বলল, 'গগন ধোপা মরমর মানে আমরা গিয়ে দেখব মরেই গেছে। ওর তো ছেলেপুলে নেই। শুধু বৌ। তাই আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে তোর কাছে এসেছি।

লালটু বলল, 'কিন্তু কাল বিকেলেই তো ধোপাদার সঙ্গে দেখা হল। ওর হয়েছিল কি?'

—শুনলাম বস্তা মাথায় করে যাবার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সারারাত নিবারণ কবরেজ আর যমে টানাটানি হয়েছে। ভোরের দিকে আরো অবস্থা খারাপ। আমাদের নাপিতদা বলল শ্বাস উঠছে। এখুনি মরবে। বলল হেবো।

হাঁটতে হাঁটতে লালটু বলল, 'গাধাটা আমাদের হিতকারী সংঘের কাছে উপকার পেল বটে, কিন্তু ধোপাদা—

ফ্যালা লালটুর কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল, 'আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা নিজেরাই তো বস্তা দু'টো পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম, ধোপাদাই তো রাজি হল না।

ফুচকা বলল, 'আসলে ধোপাদার মৃত্যু লেখা ছিল কপালে।

ল্যাঠা বলল, 'যা-যা-যা হবার হয়ে গেছে। ধোপাদাকে শুধু পো-পোড়ানো নয়। শা-শা শ্রাদ্ধের কাজ কর্মের ভারটা কিন্তু আমরাই নেব।'

শাণ্টু বলল, 'সে তো বটেই। আজই ধোপাদার বৌকে বলে আসব হিতকারী সংঘের সভ্যরা থাকতে কোন চিন্তা নেই।'

হেবো বলল, 'আমার মানুষ পোড়ানো দেখতে বিচ্ছিরি লাগে। ধোপাদাকে চিতায় চাপানোর পরই কিন্তু আমি চলে আসব শ্মশান থেকে।

বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় লালটু বলল, 'একটা খাটিয়া নিয়ে গেলে হয় না ?'

শাণ্টু বলল, 'একটা বাঁশের খাটিয়া তো লাগবেই ধোপাদাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে। নিয়েই চল। টাকাটা না হয় চেয়ে নিয়ে পরে দিয়ে যাব।'

ল্যাঠা বলল, 'আ-আগে ত্যাখ ওদের বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে গেছে কিনা—'

এ বাজারে খাটিয়ার দোকান একটাই। দোকানের মালিক ভজনকে ফুচকা জিজ্ঞেস করল, 'গগন ধোপাদার জন্য কেউ খাটিয়া নিয়ে গেছে ভজনদা ?'

—কেন গো ফুচকাবাবু ?

—ধোপাদা যে মারা গেছে।

—সে কি! আ-হা-হা লোকটা খুব ভাল ছিল গো। ও যে আমার কাছে ক'টা টাকা পেতো।

লালটু বলল, 'তাহলে একটা খাটিয়া দাও। দামটা ওই টাকা থেকেই কেটে যাবে।

ভজন শুধু খাটিয়াই দিল না। তু'প্যাকেট ধূপকাঠিও দিয়ে দিল।

হিতকারী সংঘের সভ্যরা যখন সেই খাটিয়া নিয়ে গগন ধোপার বাড়িতে পৌঁছলো তখন নিবারণ কবরেজ বেরুচ্ছিলেন গগনের বাড়ি থেকে।

খাটিয়া কাঁধে গামছা হাতে হিতকারী সংঘের সভ্যদের দেখে অবাক হলেন তিনি। বললেন, কি ব্যাপার, এখানে কি চাই তোদের ?'

লালটু বলল, 'আমরা হিতকারী সংঘের সদস্য।'

—হিতকারী সংঘ ! তা কি চাই এখানে ?

—আমরা ধোপাদার শ্মশানযাত্রী হতে এসেছি।

—শ্মশানযাত্রী ! তার মানে ?

—মানে আমরা ধোপাদাকে দাহ করা থেকে শ্রাদ্ধের সব কাজ করতে চাই।

—কী, না মরতেই শ্মশানে নিয়ে যেতে এসেছিস ! ফাজলামি করার জায়গা পাস না ! বাঁদর ছোকরা, কাল লোকটাকে মারার ব্যবস্থা করে আজ এসেছিস শ্মশানযাত্রী হতে ! মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। নিবারণ কবরেজ তাঁর হাতের লাঠি নিয়ে এমন তাড়া করলেন যে খাটিয়া ফেলে রেখে সকলে মারল ছুট।

ছুটতে ছুটতে একেবারে পার্কে।

হাঁপাতে হাঁপাতে শান্টু বলল, 'তাহলে এখনো মরেনি ধোপাদা !'

হেবো বলল, 'নাপিতদা যে বলেছিল শ্বাস উঠছে। শ্বাস উঠলে লোকে বাঁচে না কি ?'

ল্যাঠা বলল, 'না—না—নাপিতদার কথা রাখ তো। নাপিতদা তো ব-ব-বড় ডাক্তার—

ফ্যালা বলল, খুব জোর বেঁচে গেছি। কবরেজ জ্যেঠুর লাঠিটা আর একটু হলেই আমার পিঠে পড়ত। হেবোটা যে কি খবর আনিস।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, ধোপাদাটা যে কী! মরলও না, আমাদের উপকার করতেও দিল না। শুধু শুধু হিতকারী সংঘের নামটা খারাপ করল।'

লালটু বলল, 'নাপিতদার কথা যদি সত্যি হয় এখন না হোক একটু পরেও মরতে পারে।'

লালটু স্কুলের টিফিনের সময় এসে খবর নিয়ে গেল, শাণ্টু খবর নিয়ে এলো বিকেলে। না, ধোপাদার আর মরার সম্ভাবনা নেই। ধোপাদা এখন ভালই আছে।

হেবো বলল, 'একটা উপকারের সুযোগ ফস্‌কে গেল!'

ওরা ভাবতে লাগল এবার কার উপকার করবে।

ফ্যালার প্রস্তাব অনুযায়ী ঠিক হল মশার ডিপো ঘোষেদের পানা পুকুরটা আগে পরিষ্কার করবে ওরা। তারপর রায় বাড়ির পাশের জংলাটা। ওই জংলাটা পরিষ্কার করলে বাজারে যাবার রাস্তা বেরোয় একটা।

তিনদিন লাগল পানা পুকুরটা পরিষ্কার করতে। তারপর যেদিন রায় বাড়ির পাশের জংলাটায় হাত লাগাল ওরা, সেদিন ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন ঘোষাল গিন্নী।

উনি বললেন, 'তোরাই হিতকারী সংঘ করেছিস? বেশ করেছিস, বেশ করেছিস; লোকের উপকার করা ধম্মের কাজ। পুন্যি হয়।

শাণ্টু বেশ ভারিক্কি চালে বলল, 'আমরা মানুষের সেবা করে ঈশ্বরকে পেতে চাই।'

ফ্যালা কাব্য করে বলল, 'মানুষে—পশুরে সেবে যেই জন সেই জন-ই সেবিছে ঈশ্বর।'

ঘোষাল গিন্নী বললেন, 'ঠিক বলেছিস। আমি চান করতে গিয়ে সকলকে বলছিলুম ছেলেরা এই একটা কম্মের মতো কম্ম করেছে। তা হ্যাঁরে, আমার বাগানটা পরিষ্কার করে দিবি না? এমন জঙ্গল হয়ে গেছে দুটো ভাল গাছ বসাতে পারি না।

—তা ক-ক-করব না কেন। আমরা তো সকলের উপকারের জন্যই আছি। বলল ল্যাঠা।

—তাহলে কাল তোরা আয়।

একটু ভেবে লালটু বলল, 'কাল শনিবার, স্কুল ছুটির পর আমরা যাব। তুমি দুটো কাটারি যোগাড় করে রেখো।

—শুধু কাটারি কেন—কাটারি, শাবল, কুড়োল সব আছে আমার ঘরে। আর শোন্, কাল মুড়ি ভাজব, গরম মুড়ি আর নারকেল নাড়ু খাবি সবাই। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, হিতকারী সংঘের সকলের ভাল কর দুর্গতিনাশিনী।

খুশি মনে চলে গেলেন ঘোষাল গিন্নী।

উনি চলে যেতে ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, এ ঠিক হল না।'

—কেন? ঠিক হল না কেন? জানতে চাইল হেবো।

—ঘোষালদাদু কেমন সুদখোর জানিস? যেমন সুদখোর, তেমনি কঞ্জুস নাম্বার ওয়ান। আমি বলছি ওই ঘোষালদাদুই আমাদের কাছে পাঠিয়েছে দিদিমাকে, যাতে বিনে পয়সায় কাজ হয়ে যায়।

লালটু বলল, 'কিন্তু যদি নিজে থেকে এসে কেউ আমাদের সাহায্য চায় আমরা তো না বলতে পারি না।'

শাণ্টু বলল, 'আমরা কে কেমন লোক দেখব না। হিতকারী সংঘের উদ্দেশ্যই হচ্ছে লোকের উপকার করা।'

লীডার আর ডেপুটি লীডারের কথার ওপর কোন কথা থাকতে পারে না, কোন আপত্তি চলতে পারে না। অতএব শনিবার ছুটির পর ঘোষাল বাড়িতে উপস্থিত হল হিতকারী সংঘের সভ্যরা।

তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন ঘোষাল গিন্নী। ওদের সাড়া পেয়ে শুয়ে শুয়েই বললেন, 'বারান্দার কোণে কাটারি, শাবল সব জড়ো করা রয়েছে তোরা কাজ করগে। একটু পরে উঠে আমি মুড়ি ভেজে ডাকব তোদের।'

নটবর ঘোষাল বসে বসে হিসাব লিখছিলেন। বললেন, একটু

দেখেশুনে সব কাজকম্ম করিস বাবারা। যেসব দরকারী গাছটাছ আছে সেগুলো যেন নষ্ট করিস না।'

লালটু বলল, 'সে আপনাকে ভাবতে হবে না ঘোষালদাছ। হিতকারী সংঘের ছ'জন সদস্য ত্বপুর রোদ মাথায় করে দারুণ স্পীডে কাজ শুরু করল।

হেবোর হাত ছড়ে গিয়ে নুন ছাল উঠে গেল। বিচুটি পাতা লেগে জ্বালা করতে লাগল শান্টুর হাত-পা। তবু কুছ্ পরোয়া নেই। ছু' ঘণ্টায় নটবর ঘোষালের বাগান গড়ের মাঠ। এখন শুধু গরম মুড়ি আর নারকেলের নাড়ুর প্রতীক্ষা।

কাটা গাছ-গাছালিগুলো একপাশে জড়ো করতে করতে সেই কথাই হচ্ছিল ওদের।

লালটু বলল, 'ফুচ্‌কা একবার রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে ছ্যাখ্‌তো দিদিমা মুড়ি ভাজছে কি না—

হেবো বলল, 'যদি না ধরিয়ে থাকে তো বলে আসবি আমাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছে।'

ফুচকা যাবে বলে ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময় ঘোষাল দিদিমা এসে উপস্থিত।

ফুচকা ভাবল বাগানটা এত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখে অবাক হয়েছেন ঘোষালদিদিমা। সে বলল, 'দিদিমা, দেখলেন তো হিতকারী সংঘের কাজ।'

ফুচকার কথা শুনতে পেলেন কি না ঘোষালগিন্নী বোঝা গেল না। হঠাৎ তিনি প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, 'ওগো দেখে যাও, আমাদের কি সব্বনাশ হয়েছে—

হিতকারী সংঘের সভ্যরা বুঝতে পারল না কী সর্বনাশ হয়েছে। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

নাকে চশমা এঁটে কাছা সামলাতে সামলাতে ছুটে এলেন

নটবর ঘোষাল। তিনিও অবাক হয়ে বাগানটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—আমি সাড়ে তিন মাইল হেঁটে বোনের বাড়ি থেকে লিচুর চারা এনেছিলুম, সিঙ্গাপুরী আনারসের গাছ এনেছিলুম—হায়-হায়-হায় কী সব্বনাশ করেছে ডাকাতগুলো—ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন ঘোষাল গিন্নী।

লালটুর খেয়াল হল ওই কোণের দিকটায় একটা চেনা চেনা গাছ ছিল বটে। শান্টুর খেয়াল হল যেটাকে সে বাজে গাছ আপনি জন্মেছে ভেবে উপড়ে দিয়েছিল তবে সেটাই লিচুগাছ।

এবার অস্ফুটস্বরে নটবর ঘোষাল বললেন, 'ছুটো ফলন্ত কুমড়ো গাছ ছিল যে—সে ছুটোও তো নেই।'

হিতকারী সংঘের সভ্যদের নীরবতা ভঙ্গ করল ফ্যালা, 'আমরা ভেবেছিলুম বাগানটা গড়ের মাঠ করতে হবে—'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নটবর বললেন 'আর আমি যে তখন বললুম দরকারী গাছগুলো নষ্ট না করতে—'

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, ঠিক করে বলবেন তো কোনটা দরকারী গাছ। ফুচকার 'ধ্যুৎ কালা' শুনে বোধ হয় অবাক হলেন নটবর। কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, কী বললি ছোকরা—আমি কালা! এতবড় আস্পর্ধা তোর! বাঁদর, উল্লুক, দাঁড়া তোর পিঠে চেলা কাঠ ভাঙব আমি—

বোধ হয় চেলাকাঠ আনতেই বাড়ির ভেতর ছুটলেন নটবর। ঘোষালগিন্নী চেঁচাতে লাগলেন, 'অলপ্পেয়ে ছোঁড়ারা, বাপ-মা কি কোন শিক্ষেই দেয় নি তোদের? তোদের মুখে ঝামা ঘষে না দিই তো আমি ঘোষাল বৌ-ই নই।'

আর এখানে থাকা নিরাপদ মনে হল না লালটুর। সে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল্ বের করে ফুর-র-র-র, ফুর-র-র-র করে বাজাল ছু'বার।

সঙ্গে সঙ্গে হিতকারী সংঘের সভ্যরা ছুটে গিয়ে বাঁশের বেড়া টপকে গেল।

কয়েকদিন মনমরা হয়ে রইল হিতকারী সংঘের সভ্যরা।

একদিন সেই মন মরা ভাবটা কাটাল হেবো। কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে, ছুটো মরা ঘাস চিবিয়ে থু-থু করে ফেলে সে বলল, 'আমার মনে হয় কি জানিস, ঘোষাল দাতু-দিদিমা প্ল্যান করেই আমাদের তাড়িয়েছে সেদিন।

—কেন-কেন, এ কথা বলছিস কেন? প্রশ্ন করল শান্টু।

—যাতে আমাদের ছ'জনকে মুড়ি-নাড়ু না খাওয়াতে হয়। যদি তা না হতো কারো না কারো বাড়িতে গিয়ে নিশ্চয়ই লাগিয়ে আসতেন ওঁরা।

হেবোর যুক্তিটা ভাবল সকলে। ভাবল, হতেও পারে। যা কেপ্পন ওঁরা।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, আমি তো তাই আগে থেকেই বলেছিলাম—'

শান্টু বলল, 'তোর ওই 'ধ্যুৎ কালা' বলা বন্ধ করতো। ওটাই আরো গোলমাল করে দিচ্ছে। আর কখনো যদি বলিস মারব চাঁটি।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, কী করব বল, মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় যে। লালটু বলল, 'কিন্তু একটা কথা, ঘোষাল দাতু অন্যায় করে থাকলেও তাঁকে কিছু বলব না আমরা। মনে রাখতে হবে আমরা হিতকারী সংঘের সভ্যরা সকলের ভাল করতে চাই।'

—ভাল করার পরেও যদি গালাগাল দেয় তবু কিছু বলা হবে না, সব সহ্য করতে হবে? জানতে চাইল ফুচকা।

এবার উত্তর দিল ল্যাঠা, সে বলল, 'ভ-ভ-ভগবান অন্যায়ের বিচার করবেন।'

লালটু বলল, 'ঠিক বলেছিস।'

ওদের মধ্যে ফ্যালা ছিল না এতক্ষণ। দেখা গেল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে সে। এসেই বসে পড়ল ধপ্ করে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দারুণ খবর আছে একটা।'

খবরটা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সকলে।

ফ্যালা বলল, 'মুখুজ্জে পিসে মানে ন'কড়ি মুখুজ্জের বাড়িতে কালীপুজো হবে।

—কালীপূজো! অসময়ে?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। মুখুজ্জে পিসে কাল ভোর রাতে স্বপ্নে মা কালীকে দেখেছেন। মা নাকি ওঁর দোরে এসে বলছেন, 'আমায় পুজো কর ন'কড়ি। আমি তোর হাতের পুজো চাই।

—তারপর-তারপর? আবার প্রশ্ন সকলের।

—তারপর আর কি, সামনের অমাবস্যায় পূজো। মানে হাতে আর মাত্র চারদিন।

—তাতে আমাদের কি? আমাদের তো আর নেমন্তন্ন হবে না। হতাশ হয়ে বলল হেবো।

ফ্যালা বলল, 'আরে হবে, হবে। আমি যখন আসছিলাম তখন মুখুজ্জে পিসে আমাকে ডাকলেন। বললেন, তোরা তো হিতকারী সংঘ করেছিস। সকলে মিলে মায়ের পূজোর ব্যবস্থাটা ঠিক মতো কর দেখি কেমন পারিস।

—তুই কি বললি? আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল হেবো।

আমি বললাম, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি এখুনি সবাইকে খবর দিচ্ছি। মুখুজ্জে পিসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তো এত দেরি হয়ে গেল।

নকড়ি মুখুজ্জেকে সত্যিই কিছু ভাবতে হল না।

কুমোরের কাছে গিয়ে ঠাকুর গড়িয়ে আনা থেকে, প্যাণ্ডেল তৈরী, এমন কি বেশ নধর দেখে কালো পাঁঠার যোগাড় করা সবই করল সংঘের ছেলেরা।

ফ্যালা, হেবো, ফুচকা তো পাঁঠাটাকে একেবারে চোখের মণির মতো আগলে রাখল। খুব করে কাঁঠাল পাতা খাওয়াল তাকে। অনেক দিন পরে মায়ের প্রসাদ যা একখানা হবে! পাঁঠার অর্ধেকটাই সাবড়ে দেবে ভেবে রেখেছে তারা।

কথায় কথায় ফ্যালা বলেই ফেলল, 'হিতকারী সংঘ করে আমাদের লাভ হয়েছে বল। মুখুজ্জে পিসে তো নেমন্তন্ন করে পাঁঠার মাংস খাওয়াত না। কিন্তু এখন? এখন আর উপায় নেই। অন্য কেউ খাক না খাক আমাদের খাওয়াতেই হবে।'

ফুচকা বলল, 'যা বলেছিস মাইরি।'

হেবো বলল, 'আমার তো পাঁঠাটাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

সবই ঠিক ঠাক চলছিল। পুজোও শুরু হয়েছিল। গোলমাল হয়ে গেল সেই অমাবস্যার রাতে পুকুর থেকে পাঁঠাটাকে স্নান করিয়ে আনতে গিয়ে।

লালটুর নিষেধ না শুনে ফ্যালা, হেবো এবং ফুচকা গিয়েছিল পাঁঠা স্নান করাতে।

অন্ধকারে পাঁঠাটাকে জলে ছুঁড়ে দিয়েছিল ফ্যালা। কিন্তু পাঁঠাটার মাথা ডুবেছে কি না ঠিক মতো বুঝতে না পেরে নিজেও জলে নেমেছিল সে। পাঁঠাটার মাথা চেপে ধরেছিল জলের মধ্যে। হয়তো মাথাটাকে জলের মধ্যে চেপে ধরা বেশীক্ষণ হয়ে গিয়েছিল তাই জল থেকে যখন টেনে তোলা হল দেখা গেল বে-আক্কেলে পাঁঠা মায়ের পুজোতে জীবন উৎসর্গ করে স্বর্গে না গিয়ে আগেই মরে বসে আছে।

কিন্তু এখন কি হবে?

ভয়ে কাঠ ওরা।

ওদের দেরি হচ্ছে দেখে লালটু, শাণ্টু, ল্যাঠা ছুটল ঘাটে। সেখানে গিয়ে তো ওদের চক্ষু স্থির!

কী করবে ভাবতে লাগল ওরা। সকলে মিলে পালাবে, না গিয়ে সব বলবে ন'কড়ি মুখুজ্জেকে—

এদিকে বলির সময় হয়ে গেছে। পাঁঠা আসছে না। খোঁজ নিতে ছুটল অনেকেই। ছুটলেন ন'কড়ি স্বয়ং।

মুখুজ্জে বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। মায়ের ভোগের পাঁঠার অপঘাত মৃত্যু। মুখুজ্জে বংশে অঘটন ঘটবে কি না কে বলতে পারে!

ন'কড়ি দাঁত কিড়মিড় করে কাপালিকের মতো বললেন, 'ওরে তোরা কে আছিস এদের সবগুলোকে বেঁধে রাখ। যদি রাতের মধ্যে পাঁঠা না পাওয়া যায় এদের সবগুলোকে বলি দেব।'

সত্যি সত্যিই দেখা গেল কজনা মিলে হিতকারী সংঘের সবাইকেই একটা ঘরে আটকে রাখল।

সেই ঘরের জানালা দিয়ে লালটু, শান্টু, হেবো, ফ্যালা, ল্যাঠা ফুচকা দেখতে পাচ্ছিল হাঁড়ি কাঠটা। কথা সরছিল না ওদের মুখ থেকে। মনে মনে ওরা ভাবছিল। সত্যি সত্যিই ওদের বলি দেবে না ন'কড়ি মুখুজ্জে। কিন্তু সেই ভাবনাটার ওপর ভরসা করতে পারছিল না। কারণ যা রাগী মানুষ ন'কড়ি মুখুজ্জে। জমিজমার ব্যাপারে এই সেদিনও মারামারি করেছেন। উনি কাউকেই পরোয়া করেন না।

কিন্তু এত রাতে কালো পাঁঠা পাওয়া কি সহজ ব্যাপার। সবাই ছোটাছুটি করছে আর খবর আনছে কারো কাছেই কালো পাঁঠা পাওয়া যাচ্ছে না।

খবরটা কানে যাচ্ছে আর হিতকারী সংঘের সভ্যদের বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যখন ওদের প্রায় আধমরা অবস্থা তখন একজন এসে খবর দিল কালো পাঁঠা পাওয়া গেছে।

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল হিতকারী সংঘের সভ্যরা।

ছাড়া পেয়ে আর সেখানে দাঁড়াল না কেউ।

কে যেন পেছন থেকে বলল, 'প্রসাদ পেয়ে যেয়ো।'

কথাটা শুনেও থামল না ওরা, মাথায় থাক প্রসাদ। প্রাণ বেঁচেছে এই ঢের!

বারবার ধাক্কা খেয়ে একেবারে মুষড়ে পড়ল হিতকারী সংঘের প্রায় সকল সদস্যই।

কেবল হাল ছাড়ল না লালটু আর শান্টু।

ওরা দু'জনে বসে বসে প্ল্যান কষতে লাগল। ঠিক করল আগে কিছু চাঁদা তুলতে হবে নিজেদের মধ্যে, তারপর নতুনভাবে খুব ভেবে চিন্তে এগোতে হবে।

ওরা প্ল্যান কষল বটে, চাঁদাও কিছু উঠল কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখা গেল না কারো।

ঠিক এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন সন্ধ্যার পর লালটু আর শান্টু সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানিয়ে এলো যে একটা বিশেষ কাজ পাওয়া গেছে। অতএব কাল রবিবার সকাল ন'টায় হিতকারী সংঘের অস্থায়ী কার্যালয় নতুন পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে উপস্থিত থাকতে হবে সকলকে। কাজটা খুবই ভাল। যথাসময়ে জানানো হবে সকলকে।

পরদিন আসবে না আসবে না করেও এলো ফ্যালা আর হেবো। কিন্তু সাড়ে ন'টা বেজে গেল—দেখা পাওয়া গেল না ল্যাঠা আর ফুচকার।

ফুচকা এলো ন'টা পঁয়ত্রিশে।

লালটু বলল, 'তোর কি টাইম জ্ঞান নেই রে? এই তোর ন'টা? আধঘণ্টার ওপর লেট।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, জ্যামিতির জন্যেই তো লেট হয়ে গেল।'

—জ্যামিতি—

—হ্যাঁ, সকালে উঠেই বাবা জ্যামিতি বই নিয়ে বসিয়েছিলেন।

—জ্যামিতি বই! এ্যাঁ, থার্ডক্লাশ। তেতো ওষুধ গেলার মতো মুখ করে বলল শান্টু। —ওই বইটা যে কে লিখেছিল—

—আমাদের বইটা তো আমাদের স্কুলের অঙ্ক স্যারই লিখেছে।

—ধুর্, অঙ্ক স্যার তো অনেক পরে লিখেছে। প্রথমে যে লিখেছে তার কথাই বলছি। সেই লোকটাকে পেলে নাকে জল-বিছুটি ঘষে দিতুম। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, সন্নিহিত কোণ, শীর্ষবিন্দু—এসব পড়ে যে কি হয় বুঝি না।

হেবো বলল, 'যদি আমি কোনদিন রাষ্ট্রপতি হই আগে জ্যামিতি বই পড়ানো বন্ধ করব।'

ফ্যালা বলল, 'তুই কোনদিন রাষ্ট্রপতি হবিও না আমাদের জ্যামিতি পড়াও বন্ধ হবে না।'

শান্টু বলল, 'বাজে কথা ছাড়, চল ল্যাঠাকে ডেকে আনি।'

কিন্তু ল্যাঠাকে ডাকতে হল না। তখনই পার্কের গেটের মুখে দেখা গেল তাকে।

ল্যাঠা এসেই ধুপ করে বসে পড়ল হাত-পা ছেড়ে। থমথম করছে ওর মুখখানা। চোখ ছুটো ফোলা ফোলা।

—তোরও কি জ্যামিতি? জিজ্ঞেস করল লালটু।

উত্তর দিল না ল্যাঠা। গুম মেরে বসে রইল।

এবার চেঁচিয়ে উঠল লালটু। বলল, 'দ্যাখ, অমন মুখ গোমড়া করে থাকলে আমি সংঘ ছেড়ে দেব বলে রাখছি।

লালটুর চেঁচানিতে কাজ হল। মুখ খুলল ল্যাঠা—প-প-পয়সা।

—পয়সা কি করেছিস?

—কা-কা-কাল বাজার থেকে আ-আ-আট আনা পয়সা মেরেছিলুম, বাবা জানতে পেরে এমন ঠেঙিয়েছে যে—

—থাম থাম, নাকে কাঁদিস না। ল্যাঠাকে থামিয়ে দিল শান্টু। পয়সা মেরেছিলি কেন ?

—সংঘের জন্যে।

—তোকে বাজার থেকে পয়সা মারতে বলেছিল কে ? চেয়ে নিতে পারিস নি ? বলল লালটু।

—চে-চে-চেয়েছিলুম। দেয় নি যে।

—এই বাবা-টাবা লোকগুলো যে কি! কিছু বোঝে না। বলল ফ্যালা।

ফ্যালার কথাকে সমর্থন করল ফুচকা আর হেবো।

শান্টু ল্যাঠাকে বলল, 'তুই দুঃখ করিস না ল্যাঠা। মহৎ কাজ করতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই যে তুই মার খেলি এটাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। যাকে বলে স্যাক্রিফাইস। তোর এই স্যাক্রিফাইসের মূল্য একদিন তুই পাবি। সেদিন দেখবি তোর বাবা অনুশোচনা করছেন।

হেবো বলল, 'আমি একটা প্রস্তাব করছি। সংঘের জন্য ল্যাঠার এই যে স্যাক্রি—কী যেন ইংরেজীটা—

—স্যাক্রিফাইস। ধরিয়ে দিল শান্টু।

—হ্যাঁ, স্যাক্রিফাইস। সংঘের জন্য ল্যাঠার এই স্যাক্রিফাইসের সম্মানে আমরা দু'মিনিট নীরবতা পালন করব।

লালটু বলল, 'গুড্ আইডিয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করল।

তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে লালটু বলল, 'হে হিতকারী সংঘের সদস্যবৃন্দ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের ঠাকুর মহাশয় শ্রী ট্যাপানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহ অদ্য অনুষ্ঠিত হবে। আমি এবং আমাদের সংঘের ডেপুটি লীডার সংবাদ নিয়ে জেনেছি যে ট্যাপা ঠাকুরের বাড়িতে কাজের লোকের অভাব রয়েছে। অতএব আমাদের পবিত্র কর্তব্য ট্যাপা ঠাকুরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে

কাজকর্মাদি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। তাই বন্ধুগণ, আমরা এখন ট্যাপা ঠাকুরের বাড়ির দিকে যাত্রা করব বলে স্থির করেছি।

লালটু যেভাবে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলল, মনে হল কথাগুলো সে লিখে মুখস্থ করেছে।

—ফল্ ইন্, ফল ইন্—

লালটুর কথা শেষ হতেই শান্টু সকলকে লাইনে দাঁড় করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেই সময় হেবো বলল, 'আমার একটা কথা আছে।'

—কি কথা? জানতে চাইল লালটু।

—ট্যাপা ঠাকুর যদি আমাদের উপকার না চান?

—না চান মানে! হিতকারী সংঘের কর্তব্য কর্মের মধ্যে রয়েছে কেউ চাক বা না চাক সংঘ মনে করলে যে করেই হোক উপকার করবে।

—আমি বলছিলুম মুখুজ্জে বাড়ির মতো যদি কিছু হয়ে যায়— একটু ভেবে নিয়ে লালটু বলল, 'যাতে তেমন অঘটন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।'

লালটু বলল বটে কিন্তু মুখুজ্জে বাড়ির কথা মনে হতে সকলেই যেন একটু দমে গেল।

শান্টু সকলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাদের অত ভয় পেলে চলবে কেন? আর সব বারই যে ভুল হবে এমন কোন কথা নেই। এবার এমন কাজ করব যাতে ধন্যি-ধন্যি করে সকলে।'

ট্যাপা ঠাকুরের বাড়িতে সত্যিই কাজের লোকের অভাব ছিল। তাই হিতকারী সংঘের ছেলেদের পেয়ে খুশীই হলেন তিনি।

সংঘের ছেলেরা ট্যাপা ঠাকুরের নির্দেশ মতো এমন ভাবে কাজ করল সারাদিন যে কোথাও কোন খুঁৎ রইল না।

তবু শেষ রক্ষা হল না।

গোলমাল হয়ে গেল পরিবেশন করতে গিয়ে।

গোধুলি লগ্নে বিয়ে। খাওয়া-দাওয়াও সকাল সকাল।

লাইন করে খেতে বসেছিল বরযাত্রীরা।

পরিবেশন করছিল হিতকারী সংঘের সভ্যরা। আর তদারক করছিলেন ট্যাপা ঠাকুর নিজে এবং তাঁর ভাই।

এঁকে ওই দে, ওঁকে তাই দে, উনাকে সেটা দে, ওটা আন, সেটা আন, এদিকে আয় তাড়াতাড়ি, ওদিকে যা···ইত্যাদি ট্যাপা ঠাকুর এবং তাঁর ভাইয়ের হুকুম মানতে হিমশিম খাচ্ছিল হিতকারী সংঘের সভ্যরা।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শান্টুর পায়ের শট্ খেয়ে বরের মেসোর জলের গ্লাস কয়েকজনের পাতার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে লাগল বরের জুলপীওয়ালা এক বন্ধুর গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল চেঁচামেচি। সেই চেঁচামেচিতে ভড়কে গেল ল্যাঠা। সে ধাক্কা খেল ডালের বাল্‌তি হাতে হেবোর সঙ্গে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে হেবো গিয়ে পড়ল বরের বাপের ঘাড়ে। বাল্‌তি গেল উল্টে, আর সব ডাল গিয়ে পড়ল বরের স্টাইলিস্ট ভাইয়ের মাথায়।

এরপর হুলুস্থূল লেগে গেল। চেঁচামেচি, হৈ-চৈ হতে হতে ঘুষোঘুষি।

বাল্‌তি টাল্‌তি ফেলে ছুট-ছুট-ছুট। ছুটতে ছুটতে পার্কে এসে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে হাঁপাতে লাগল হিতকারী সংঘের সভ্যরা। দোষারোপ করতে লাগল একে অপরকে। দোষারোপ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধে আর কি!

অবস্থা যখন চরমে ঠিক সেই সময় হঠাৎ লাল্টুর নজরে এলো এই নির্জন পার্কের এক কোণে একটা বাচ্চা মেয়ে বসে রয়েছে।

ঠোঁটে আঙুল চেপে হু-স্-স্-স্ শব্দ করে সকলকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল লালটু। তারপর এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

দেখাদেখি সকলেই সঙ্গ নিল লালটুর।

—কে রে তুই ?

লালটুর প্রশ্নে মুখ তুলল মেয়েটি। আশ্চর্য করুণ মুখখানা। পার্কের আলোয় দেখা গেল কান্নায় ভাসছে সেই করুণ মুখখানা, মেয়েটাকে কেউই চিনতে পারল না।

—কি নাম তোর ? এখানে বসে কাঁদছিস কেন ? আবার জিজ্ঞেস করল লালটু।

কোন উত্তর দিল না মেয়েটি।

ধমকে উঠল শান্টু।—'অ্যাই, তুই আচ্ছা মেয়ে তো! উত্তর দিস না কেন ? তুই বোবা না কি ?'

এবার মুখ খুলল মেয়েটি। নাম বলল ঝুনু। কিন্তু পদবী, বাবা-মায়ের নাম বাড়ির ঠিকানা কিছুই বলল না।

অনেক জেরা করে, ভয় দেখিয়ে, মিষ্টি কথা বলে জানা গেল ওর বাপ-মা নেই। বাড়িও এখানে না, ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসেছে ঝুনু। সারাদিন কিছুই খায় নি।

লালটুর মনে হল মেয়েটা খুবই দুঃখী। অনেক দিনই হয়তো পেটপুরে খেতে পায় নি মেয়েটা। সে বলল, 'শান্টু, ফাণ্ডের পয়সাগুলো তোর পকেটে আছে না ?'

শান্টু পকেটে হাত দিয়ে বলল, আছে।

—কত আছে ছাখ।

পয়সাগুলো গুনলো শান্টু, চল্লিশ পয়সা।

ছুটে গিয়ে পাঁউরুটি আর বাতাসা নিয়ে আয় তো।

ছুটে গিয়ে পাঁউরুটি বাতাসা নিয়ে এলো শান্টু।

ঝুনুকে খেতে দিল।

ঝুনু খেতে লাগল। আর হিতকারী সংঘের সভ্যরা ভাবতে বসল কী করে ঝুনুর উপকার করা যায়।

ভাবতে গিয়ে ভাল-মন্দ মিশিয়ে জট পাকিয়ে গেল ভাবনা-

গুলো। অবশেষে লালটু বলল, 'পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে। তার আগে আজ রাতের মতো কারো বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ঝুনুর। এই দায়িত্ব কে নিতে রাজি আছ বলো ?

শান্টু বলল, 'এই দায়িত্ব আমি নিতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমার বাবা বড্ড রাগী মানুষ। মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হয় তাঁর। তাই সাহস হচ্ছে না।

ফ্যালা বলল, 'আমার বাড়িতেও একই অবস্থা।'

ল্যাঠা, ফুচকার বাড়িতেও দেখা গেল অনেক অসুবিধা।

শেষে রাজি হয়ে গেল হেবো।

ঠিক হল যদি কোন অসুবিধা হয় তবে আধঘণ্টার মধ্যে ঝুনুকে নিয়ে ফিরে আসবে হেবো, তখন অন্য ব্যবস্থা দেখা হবে।

ঝুনুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি গেল হেবো। আর সকলে অপেক্ষা করতে লাগল কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঝুনুকে নিয়ে সত্যি সত্যিই ফিরে এলো হেবো। বলল, 'ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। ট্যাপা ঠাকুরের ভাই এসে সাতখান করে নালিশ করে গেছে বাবার কাছে। আমরা নাকি ইচ্ছে করে বরযাত্রীদের হেনস্তা করেছি। মা বললে বাবা ফায়ার হয়ে আছে। এই সময় যদি আবার অচেনা মেয়েকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া হয় তবে একেবারে কুরুক্ষেত্তর করে ফেলবে বাবা।'

মহাভাবনায় পড়ে গেল হিতকারী সংঘের সভ্যরা। নিশ্চয়ই সব বাড়িতেই সাতখান করে লাগিয়ে এসেছে ট্যাপাঠাকুরের ভাই। অতএব কারো বাড়িই নিরাপদ নয়।

তাহলে ?

লালটু গালে হাত দিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর যেন 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব দেখিয়ে বলল, 'তোদের কিছু ভাবতে হবে না। আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যাব।'

সে সকলের সামনে 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব দেখাল বটে, কিন্তু ঝুনুকে নিয়ে যতই বাড়ির কাছে যেতে লাগল ততই দুর্ভাবনা বাড়তে লাগল তার।

লালটুর বাবা সদর দরজার দিকে মুখ করে ইজিচেয়ারে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলেন।

দরজার পাশে ঝুনুকে দাঁড় করিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল লালটু। তারপর ভেতরে ঢুকল।

লালটুকে ঢুকতে দেখে লালটুর বাবা বইটা বন্ধ করলেন। বললেন এই যে হিতকারী সংঘের লীডার, তুমি দয়া করে লোকের উপকার করা বন্ধ করবে কি?'

লালটুর বুঝতে বাকি রইল না ট্যাপা ঠাকুরের বাড়ির ঘটনা তার বাবার কানেও পৌঁচেছে।

লালটুর ঠাকুমা ঘরে ছিলেন। অশান্তির ভয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন তিনি। বললেন, 'ওকে বকছিস কেন খোকা? ওদের হিতকারী সংঘ সকলের ভাল করার চেষ্টা করছে। সত্যিকারের উপকার করতে চাইছে। কিন্তু সুযোগ পেয়ে বুড়ো ধাড়ি লোকগুলো বে-আক্কেলের মতো যদি খাটায় ওদের তবে তো গোলমাল হবেই, অতটুকু অতটুকু ছেলেরা কি পরিবেশন করতে পারে?

লালটুর বাবা বললেন, 'আমি অতশত জানতে চাই না মা। লোকে বাড়ি বয়ে এসে নালিশ করে যাবে সেটা শুনতে রাজি নই আমি। এটাই আমার সাফ কথা।'

লালটুর বাবার কথার পিঠে কী যেন বলতে লাগলেন লালটুর ঠাকুমা। খেয়াল করল না লালটু। ঝুনুকে ইশারা করে ডাকল সে।

লালটুর পাশে এসে দাঁড়াল ঝুনু।

সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল লালটুর ঠাকুমা আর বাবার।

লালটুর মা বললেন, 'এ মেয়েটি আবার কে?'

লালটু বলল, 'এ ঝুনু।'

—ঝুনু ! কার মেয়ে ?

—ওর বাবা-মা নেই। পার্কে বসে কাঁদছিল তাই নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।

—ও কি আমাদের বাড়িতে থাকবে ? অবাক হলেন ঠাকুমা।

লালটুর ঠাকুমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন লালটুর বাবা। বললেন, 'সেই মতলবেই নিয়ে এসেছে বুঝতে পারছ না ? এরপর মেয়েটার আত্মীয় স্বজন এসে কথা শোনাবে আমাদের।'

ঠাকুমা বললেন, 'কার না কার বাড়ির মেয়ে। হয়তো পালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। ওকে বাড়ি যেতে বলে দে লালটু।'

লালটুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মেয়ে, তোর বাড়ি কোথায় ?'

ঝুনু উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে।

লালটু বলল, 'ও ট্রেনে করে এসেছে এখানে।'

লালটুর বাবা বললেন। 'তাহলে আর এত রাতে যাবে কোথায় ? আজ না হয় থাক। কাল সকালে দেখা যাবে।'

লালটুর ঠাকুমা ঝুনুকে ঘরে শুতে দিতে রাজি হলেন না। বললেন, 'কী জানি কোন জাতের মেয়ে সত্যি-মিথ্যে কি বলছে ওর ব্যবস্থা অন্য ঘরে কর বৌমা।'

ঠাকুমার কথা শুনে খুব রাগ হল লালটুর। কিন্তু কিছু বলল না সে।

অবশেষে ভাঁড়ার ঘরের এক পাশে মাদুর পেতে শোবার ব্যবস্থা হল ঝুনুর।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল লালটুর শুনল বাবা মাকে বলছেন 'মেয়েটা ঘুম থেকে উঠলে কিছু খেতে দিয়ো। তারপর জগাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো ওর বাড়িতে।

লালটুদের বাড়ির উত্তর দিকের মাঠটা পেরুলে জগাদের বাড়ি। তার কথাই বললেন লালটুর বাবা।

লালটুর মা বললেন, 'কোথায় বাড়ি তা তো কাল বলে নি মেয়েটা। আজও যদি না বলে ?'

—তাহলে থানায় পাঠিয়ে দিয়ো।

থানার কথা শুনে বুকের ভেতরটা কেন যেন কেঁপে উঠল লালটুর।

বাবা অফিস বেরিয়ে যেতেই ভাঁড়ার ঘরের দরজার কড়া নাড়ল সে।

কিন্তু দরজা খুলল না ঝুনু।

লালটু মনে মনে বলল, 'আচ্ছা ঘুমকাতুরে মেয়ে তো !

হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসল লালটু। কিন্তু মন বসল না। শুধু থানার কথা মনে হতে লাগল তার।

রান্নাঘর থেকে মা বললেন, 'লালটু, জগাকে একটু ডেকে আন তো বাবা।'

লালটুর বুঝতে বাকি রইল না জগাকে দিয়ে ঝুনুকে থানাতেই পাঠাবেন মা। কারণ ঝুনু ঠিকানা বলবে না কিছুতেই।

জানা সত্ত্বেও লালটু জিজ্ঞেস করল, 'জগাদাকে কেন ডাকব মা ?'

মা বললেন, 'দরকার আছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে লালটুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে জানে জগাদা প্রায়ই মায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। ইদানীং টাকা ধার নিয়ে আর শোধ দেবার নাম করছে না জগাদা। কদিন আগে লালটুর মা লালটুকে দিয়ে টাকার তাগাদা করতে পাঠিয়েছিলেন জগাদার কাছে। জগাদা টাকাও দেয়নি, লালটুদের বাড়িমুখোও হয়নি।

জগাদের বাড়িতে গিয়ে লালটু দেখল জগাদা গরুর জন্য খড় কাটতে কাটতে খড় চিবুচ্ছে। জগা অবশ্য খড় খায় না। তবে খড় কাটার সময় খড় চিবুনো তার অভ্যাস।

লালটু বলল, 'জগাদা, মা তোমায় ডাকছে।'

—কেন রে ?

—বোধ হয় সেই টাকার জন্যে।

—ও। ঢোক গিলল জগা।

লক্ষ্য করল লালটু।

হঠাৎ খড় কাটা রেখে দিয়ে উঠে পড়ল জগা। তাড়াতাড়ি জামাটা গলিয়ে বলল, 'ইস্-স্, ভুলে গিয়েছিলাম, আজ আমার মুকুন্দপুর যাবার কথা। শোন, মাকে বলিস পরে দেখা করব। একটা জরুরী কাজে মুকুন্দপুর যাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল লালটু। জগাদার গমন পথের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল। তারপর শিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরল।

মা বললেন, 'জগাকে বলেছিস আসতে?'

—বলেছি। জগাদা বল্‌ল, একটা জরুরী কাজে মুকুন্দপুর যাচ্ছে এখন, পরে দেখা করবে।

—পরে কখন?

—তা বলল না।

—ঠিক আছে। তুই ডাক তো মেয়েটাকে। এত বেলা হল এখনো উঠল না—

লালটু ভাঁড়ার ঘরের দরজার কড়া নাড়ল। এবারও দরজা খুলল না ঝুনু। সাড়াও দিল না।

এবার দরজাটা ঠেলল লালটু। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। কিন্তু ঝুনু কোথায়? কেউ নেই ঘরে।

ঘর থেকে চেঁচিয়ে লালটু বলল, 'মা, ঝুনু তো ঘরে নেই।'

—সে কি, গেল কোথায়?

মাথায় ভিজে গামছা নিয়ে কাঁখের কলসী থেকে জল ছিটোতে ছিটোতে সেইমাত্র ফিরলেন লালটুর ঠাকুমা।

তিনি বললেন, 'ভাঁড়ার ঘরটা ভাল করে ছাখ তো বৌমা কি কি জিনিস খোয়া গেছে। ও মেয়ের পেছনে নিশ্চয়ই অন্য লোক আছে। না জেনে শুনে বাড়িতে কাউকে থাকতে দেওয়া আজকাল মোটেই

উচিৎ না। এই তো সেদিন মিত্তির বাড়িতে কী কাণ্ডটাই না ঘটে গেল!'

বকবক করতে লাগলেন ঠাকুমা।

লালটুর মা ভাঁড়ার ঘরের সব টিন হাঁড়ি-কুড়ি দেখলেন।

না, কোন কিছুই খোয়া যায় নি। সব ঠিক আছে।

বাড়ির আশে-পাশে খোঁজা হল। কোথাও পাওয়া গেল না ঝুনুকে।

হিতকারী সংঘের সদস্যদের খবর দিল লালটু। তারপর সকলে মিলে খুঁজতে লাগল নদীর ধার, বড় রাস্তা, বুড়ো শিবতলা, স্টেশন। —না, কোথাও নেই ঝুনু।

ওরা ক্লান্ত হয়ে ঢুকল পার্কে। আর পার্কে ঢুকেই আর্কিমিডিসের মতো সকলে চেঁচিয়ে উঠল—ইউরেকা, ইউরেকা—পেয়েছি, পেয়েছি।

পার্কের সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে ঝুনু।

ওরা ঘিরে ধরল ঝুনুকে।

মুখ তুলল ঝুনু।

সকলে দেখল কাঁদছে ঝুনু।

শাণ্টু বলল, 'এই কাঁদছিস কেন? নিজে অন্যায় করে আবার কান্না হচ্ছে! একদম কাঁদবি না। উঃ, কী মেয়ে রে বাবা খুঁজতে খুঁজতে জীবন বেরিয়ে গেছে আমাদের।'

লালটু বলল, 'কাউকে না বলে আমাদের বাড়ী থেকে চলে এসেছিস কেন?'

ঝুনু বলল, 'তোমার বাবা আমাকে থানায় দিতে বলেছেন। থানা থেকে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। তারপর বাড়িতে আবার সবাই মিলে আমাকে বকবে, মারবে, ঘরে আটকে রাখবে, খেতে দেবে না—' কাঁদতে লাগল ঝুনু।

—তোর বাড়ি কোথায় বল, আমরা সঙ্গে যাব। কেউ তোকে কিচ্ছু বলবে না। বলল ফ্যালা।

—না—কিছু বলবে না! জানো, আমি সব কাজ করতে পারি না বলে কাকীমা, কাকীমার ছেলে-মেয়ে সবাই কিরকম মারে। দেখবে—এই দ্যাখ—

পিঠের কাছ থেকে জামাটা সরিয়ে দিল ঝুনু।

শিউরে উঠল সকলে।

কালসিটে পড়ে রয়েছে পিঠটায়। খানিকটা ঘা হয়ে গেছে।

—আর দেখবে?—এই দ্যাখ, এই দ্যাখ—সেদিন ভাতের ফ্যান গালতে গিয়ে হাঁড়িটা পড়ে গিয়েছিল বলে উনুন থেকে কয়লা তুলে আমার গায়ে দিয়ে দিয়েছিল—জানো—

ঝুনুর সর্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন।

—ধ্যুৎ কালা তোকে আর বাড়ি যেতে হবে না। বলল ফুচকা।

—কিন্তু কো-কো-কোথায় থাকবে? জিজ্ঞেস করল ল্যাঠা।

লালটু বলল, 'চল, বাউলদার বাড়ি যাই। বাউলদাকে বলি গিয়ে।'

প্রস্তাবটা মনঃপূত হল সকলেরই।

ঝুনুকে সঙ্গে নিয়ে বাউলদার বাড়ি চলল ওরা।

বাউলদা—অর্থাৎ হরিদাস বাউল। লোকে বলে হরি বাউল।

এই মফঃস্বল শহরের এক প্রান্তে অন্ধ স্ত্রীকে নিয়ে থাকে হরি বাউল। ওদের তিনকুলে আর কেউ নেই। না আত্মীয়স্বজন না ছেলেমেয়ে।

ঝুনুকে সঙ্গে নিয়ে হিতকারী সংঘের সদস্যরা উপস্থিত হল বাউল-বাড়ি।

বাউলকে সব বলল লালটু। ঝুনুও বলল তার দুঃখের ইতিহাস।

বাউল চুপ করে সব শুনল। তারপর বলল, 'সবই তাঁর ইচ্ছে।'

বাউল-বৌ ভবানী ঝুনুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'মা

আমার বড় কষ্ট পেয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। যার বাপ মা নেই সে যে কত অসহায় আমি বুঝি।'

একসময় ভবানী জিজ্ঞেস করল, 'সকলে তোর ওপর অত্যাচার করে তোর কাকা কিছু বলেন না ?

ঝুনু বল্‌ল, কাকু খুব ভয় পায় কাকীকে। আমি কতদিন কাকুকে বলেছি কাকী আমাকে পেট ভরে খেতে দেয় না, মারে, বকে ; তবু কাকু কিছু বলে নি কাকীকে। আমি কতদিন যে পেট ভরে খাইনি—

কান্নায় বুজে আসছিল ঝুনুর কণ্ঠস্বর।

ভবানী ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্‌ল, 'তুই আর বলিসনে মা। আমি সইতে পারি না।

সইতে পারছিল না হরিও।

দাওয়ায় বসে একতারা বাজিয়ে গান ধরল সে। সব হারানোর ব্যথায় ব্যথিত মানুষের গান। সেই গান শুনতে শুনতে কাঁদল ভবানী। আর ওদের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঝুনু। ওর মনে হল ওর দুঃখে দুঃখী এই মানুষ দুটি তার সত্যিকারের আপনজন।

আর হিতকারী সংঘের সদস্যদের মনে হল ওরা যেন বাপ-মা-হারা ঝুনুকে নতুন করে বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

মাত্র ক'টা দিনেই হরি আর ভবানীর চোখের মণি হয়ে উঠল ঝুনু। তার ওঠা-বসা-খাওয়া-হাসি-গল্প যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করল হরি আর ভবানীর নিরুত্তাপ জীবনে। আর ঝুনুও যেন জীবনের স্বাদ খুঁজে পেল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ির ঠিকানা বলেছে হরিকে কারণ হরি কথা দিয়েছে তাকে তার কাকা-কাকীর কাছে কখনো ফিরিয়ে দেবে না।

প্রথমে হরি আর ভবানীকে মামা-মামী ডাকতে শুরু করেছিল ঝুনু। একদিন সে বল্‌ল, 'মামা-মামী ডাকতে ভাল লাগে না আমার। কোনদিন তো কাউকে বাবা-মা ডাকিনি, বাবা-মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে তোমাদের।'

ভবানী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাবা-মাকে মনে পড়ে না ?'

—কী করে মনে পড়বে ? তখন যে আমি খুব ছোট। বলল ঝুনু। একটু থেমে বলল, তোমাদেরকে বাবা-মা বলে ডাকলে রাগ করবে তোমরা ?'

—তাই ডার্কাব মা, তাই ডাকবি। আমার মন বলছে গতজন্মে আমাদেরই মেয়ে ছিলি তুই। এ জন্মে অন্য ঘরে জন্মেছিলি বটে কিন্তু ভগবান আবার মিলিয়ে দিয়েছেন। বলল হরি।

—মা-মা-মা··বাবা-বাবা-বাবা···

বারবার ডাকতে লাগল ঝুনু। হাসি-খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখখানা।

সেই হাসির ঢেউ আছড়ে পড়ল হিতকারী সংঘের সদস্যদের মুখেও।

গর্বে, তৃপ্তিতে, আনন্দে ফেটে পড়ল ওরা।

হ্যাঁ, একখানা কাজের মতো কাজ করেছে বটে।

একদিন তো নেমন্তন্নই পেয়ে গেল ওরা। পেটপুরে মিষ্টি খাওয়ার নেমন্তন্ন।

সেদিনই এক অদ্ভুত সুন্দর প্রস্তাব করল দলপতি লালটু। সে বললে 'আজ আমাদের ভাই ফোঁটা এবং বোন ফোঁটা হবে। আমাদের ফোঁটা দেবে ঝুনু আর আমরা ফোঁটা দেব আমাদের সংঘের একমাত্র সদস্যা ঝুনুকে।'

হেবো বলল, 'কিন্তু এখন কি ভাই ফোঁটা হয় ? ভাই ফোঁটা তো সেই কালীপূজোর পরে।'

লালটু বলল, 'সে তো একটা দিন আছেই। তাছাড়াও ভাই ফোঁটা যখন তখনই হতে পারে। বোন ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে যমদুয়ারে কাঁটা যে কোন দিনই দিতে পারে। তাতে কোন বাধা নেই। ঝুনু আমাদের যমদুয়ারে কাঁটা দেবে আমরাও ঝুনুকে ফোঁটা দিয়ে ঝুনুর জন্য যমদুয়ারে কাঁটা দেব।'

লালটু কথাগুলো বলল বেশ গম্ভীর ভাবে এবং অভিজ্ঞের মতো।

হরি এবং ভবানী নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল।

পরে হরি বলল, 'বেশ, তাই হোক। আজ একবার ফোঁটা হোক আবার কালীপূজোর পরেও না হয় হবে।'

হরির বাড়িতে সেদিন দারুণ হৈ-চৈ হয়ে গেল।

নতুন জামা পরে ঝুনু ফোঁটা দিতে বসল দাদাদের। সে বলল :—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের তুয়ারে পড়ল কাঁটা
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।'

আবার ঝুনুকে ফোঁটা দেবার সময় হিতকারী সংঘের সভ্যরা বলল :—

'বোনের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের তুয়ারে পড়ল কাঁটা
বোন আমাদের সোনার বাটা।'

ফোঁটার পরে শুরু হল জলসা।

ওরা নিজেরাই আর্টিস্ট, নিজেরাই শ্রোতা।

প্রথমেই আবৃত্তি করতে উঠল ল্যাঠা।

তু'লাইন বলার পরে এমনভাবে আটকে গেল তার কথা যে নিজের মাথাতে তু'বার চাঁটি মেরেও কথাটা বের করতে পারল না সে।

এরপর গান ধরল ফ্যালা। তার গলার এমনই জোর যে সকলের কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। তিন লাইন গেয়ে আর সে মনে করতে পারল না গানের কথাগুলো।

বসে পড়ল সে। বাঁচল শ্রোতারা।

এরপর উঠল ফুচকা। একটা হাসির গল্প বলবে সে।

কিন্তু গল্প বলবে কি ফুচকা। তার যে নিজেরই হাসি পাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কয়েকবার 'ধ্যুৎ কালা', 'ধ্যুৎ কালা' বলে বসে পড়ল সে-ও।

ল্যাঠা, ফ্যালা, ফুচকার পর আর শান্টু, লাল্টু, হেবো সাহস পেল না কিছু করতে।

শেষ পর্যন্ত গান ধরল হরি। তার সঙ্গে গলা মেলাল ঝুনু। এই ক'দিনেই হরির কাছে দুটো গান শিখেছে সে। তার গলাটাও ভাল।

জলসা শেষে হৈ-হৈ করতে করতে বাড়ি ফিরল সকলে।

সেদিন সব চাইতে খুশি লাল্টু। কারণ ভাই ফোঁটা তার জীবনে প্রথম। ফুচকা, ল্যাঠা, ফ্যালা, শান্টু, হেবো—সকলেরই ছোট বোন বা দিদি আছে। কিন্তু লাল্টুর নেই। সে যখন এক বছরের তখন নাকি একটা বোন হয়েছিল তার। মাত্র আট মাস বেঁচে ছিল সে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে লাল্টু ভাবল একটা ভুল হয়েছে তার। সে তো ঝুনুর বড়, তার কিছু দেওয়া উচিৎ ছিল ঝুনুকে।

লাল্টুর মা লাল্টুর কপালে ফোঁটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'তোর কপালে ফোঁটা কিসের?'

একগাল হেসে লাল্টু বলল, 'আজ যে আমাদের ভাই-ফোঁটা হল।'

—ভাই-ফোঁটা!

দাওয়ায় বসে কুটনো কুটছিলেন লাল্টুর ঠাকুমা। অবাক হয়ে বললেন, 'এখন ভাই ফোঁটা কিসের? তাছাড়া তোকে ভাই ফোঁটা দেবে কে?'

—কেন, ঝুনু! ঝুনু ফোঁটা দিয়েছে। হরিদার বাড়িতে আমরা সবাই ফোঁটা নিলাম ঝুনুর কাছে। হরিদা বলেছে কালীপূজোর পরে ফোঁটার দিনেও ফোঁটা হবে।'

—হরির যে কি আক্কেল। পরের মেয়েকে নিয়ে কী যে শুরু করেছে!

লালটুর বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি বললেন, 'হরি একদিকে ভালই করেছে। মেয়েটা বেঁচে গেছে। মেয়েটার ব্যাপারে যা শুনলাম হরির কাছে সে তো ভয়ানক—'

লালটুর মা বললেন, 'তবু ওর বাড়ির লোক তো ভাবছে।

—হ্যাঁ ভাবছে—বেঁচে গেছি। তবে হরি বলেছে, কদিন পর ওর বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে আসবে। ঝুনুকে চেয়ে নেবে ওর কাকা-কাকীর কাছ থেকে।

ঠাকুমা বললেন, 'তা হলে তো ভালই হয়। ওদেরও ছেলে মেয়ে নেই—লালটুকে লালটুর বাবা বললেন, 'তুই যে ফোঁটা নিলি তা বোনকে কি দিলি?'

—জিনিস টিনিস কিছু দিই নি, তবে আশীর্বাদ করেছি। বলল লালটু।

—কি আশীর্বাদ করলি?

—ওর মাথায় ধান দুব্বো দিয়ে বললাম, ও যেন রাজ-রাণী হয়। আর মনে মনে ভগবানকে বললাম ভগবান, আমার বোন যেন আর কোন দিন দুঃখ না পায়।

লালটুর বাবা কী যেন ভাবলেন একটু। পরে বললেন, 'একদিন খেতে বলিস মেয়েটাকে। আর কাল আমি একটা জামা কিনে আনব সেটা দিয়ে আসিস। বলিস ফোঁটার জন্য দিচ্ছিস।'

খুশির ওপর খুশি।

যেন খুশির সমুদ্রে ভাসতে লাগল লালটু। ওর বাবা যে এত সদয় হবেন কল্পনাই করতে পারে নি ও।

রাতে ঠিক মতো ঘুমোতে পারল না লালটু।

স্বপ্ন দেখল—ঝুনু ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বাড়িতে। বাবা-মা-ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করছে। মা বললেন, 'ঝুনু আমার সেই হারানো মেয়ে। ও সত্যিই তোর বোন লালটু।'

মায়ের কথা শুনে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল ঝুনু। জড়িয়ে

ধরল মাকে। জড়িয়ে ধরল লালটুকে। বারবার ডাকতে লাগল—দাদা-দাদা আমার দাদা—

হঠাৎ লালটু দেখল ঝুনু আকাশে উড়ে যাচ্ছে। মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। মেঘের আড়াল থেকে ওর ডাক ভেসে আসছে।

—দাদা—দা-দা-আ-আ-আ—

—ঝুনু—তুই কোথায়? তোকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। ঝুনু-উ-উ-উ—

—এই যে দাদা, আমি এখানে। দাদা—দা-দা-আ-আ-আ—

ঘুম ভেঙ্গে গেল লালটুর।

ঠাকুমা বললেন, 'কিরে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অমন গোঁ-গোঁ করছিলি কেন? স্বপ্ন দেখছিলি?

লালটু চোখ দুটো ডলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠাক্‌মা জানো আমি কি স্বপ্ন দেখলাম?'

—কি?

ঝুনু আমার সত্যিকারের বোন।

কেন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লালটুর ঠাকুমা। অন্ধকারেও সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল লালটু।

—ওকে দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানো ঠাক্‌মা? মনে হয়েছে ও যেন আমার অনেকদিনের চেনা। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এমন তো হতেও পারে আগের জন্মে সত্যিই ও আমার বোন ছিল—

—হতেও পারে।

কথাটুকু বলে পাশ ফিরে শুলেন ঠাকুমা।

কিছুক্ষণ পরে লালটু আবার বলল, 'সত্যিই ও আমার বোন ছিল কিনা কি করে জানা যায় বলতো ঠাক্‌মা?'

কোন উত্তর দিলেন না ঠাকুমা।

লালটু বুঝতে পারল না ঠাকুমা ঘুমিয়েছেন কিনা। তবে সে আর ঘুমোতে পারল না।

সকালে স্নান করে এসে লালটুর বাবা-মাকে লালটুর স্বপ্নের কথাটিই বললেন ঠাকুমা। সব শেষে বললেন, 'ঠাকুরের কী লীলা কে জানে!'

লালটু দেখল একে অপরের চোখে চোখ রাখলেন বাবা-মা। মনে হল চোখে চোখে কথা বললেন তাঁরা। তবে কী যে বললেন বুঝতে পারল না লালটু। সারাদিনই ওর মনে হল আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছেন মা। অন্যদিনের চাইতে কথা বলছেন অনেক কম।

রাতে বাবা ফিরলেন একটা জামা নিয়ে। ঝুনুর জামা।

জামাটা খুব পছন্দ হল লালটুর। অদ্ভুত সুন্দর রঙ জামাটার। খুব সুন্দর মানাবে ঝুনুকে। লালটুর ইচ্ছে হল এখুনি ছুটে গিয়ে ঝুনুকে দিয়ে আসে জামাটা। কিংবা ঝুনুকে ডেকে নিয়ে আসে বাড়িতে।

পরদিন ঝুনুকে ডেকে আনার কথা মা-ই বললেন লালটুকে।

মায়ের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ছুটল লালটু।

পথে ল্যাঠার সঙ্গে দেখা। সে ঝুনুকে একটা জিনিস দিতে যাচ্ছে। বলল, 'ভাই ফোঁটার দিন দিই নি তো, তাই।'

—কি জিনিস রে? জানতে চাইল লালটু।

ল্যাঠা বলল, 'পরে দেখবি।'

বাউল বাড়ি গিয়ে পকেট থেকে যা বের করল ল্যাঠা সেটা একটা ঝুমঝুমি।

ঝুমঝুমি দেখে হেসে ফেলল লালটু। বলল, 'তোর মাথায় একদম বুদ্ধি নেই। ঝুমঝুমি নিয়ে খেলবে?'

কথাটা সত্যিই ভাবে নি ল্যাঠা। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি ঝুমঝুমিটা পকেটে রাখতে গেল!

কিন্তু ঝুনু বলল, 'ওটা আমার জন্য যখন এনেছো ফিরিয়ে নিয়ো না ল্যাঠাদা।'

লালটু বলল, 'না, ফিরিয়ে নিবি না, ঝুনুকে ওটা দে। দাদার দেওয়া সব জিনিসেরই মূল্য আছে, তাই না রে ঝুনু ?

ঝুনু বলল, 'হ্যাঁ।'

খুশি হল ল্যাঠা। বলল, 'এটা ঘরে রেখে দিস। য-যখনই ঝু-ঝুমঝুমিটা দেখবি ত-তখনই আমার কথা মনে পড়বে তোর।'

ঝুনু ঝুমঝুমিটা নাড়িয়ে শব্দ করল।

লালটু বলল, 'আমার মা তোকে যেতে বলেছে।'

—আমাকে! যেন ভয় পেল ঝুনু। বলল, 'তোমার বাবা আমাকে থানায় দিয়ে আসবেন না তো ?

লালটু বলল, 'না রে না, আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে তুই অবাক হয়ে যাবি।'

হ্যাঁ, সত্যিই অবাক হল ঝুনু।

যত না অবাক হল লালটুর দেওয়া জামা পেয়ে তার চাইতে অনেক বেশী অবাক হল লালটুর ঠাকুমা আর মায়ের ব্যবহারে, আদর-যত্নে।

লালটুর ঠাকুমা এবং মা ওকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। ঝুনুদের বাড়ির কথা শুনলেন। আর কেন যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ঝুনুকে।

ঠাকুমা বললেন, 'আবার আসিস মা, যখনই ইচ্ছে হবে তখনই চলে আসবি।'

লালটুর মা ঝুনুর মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিলেন। বললেন, 'এই তেলটা নিয়ে যা, মাখিস। পারলে প্রতিদিন একবার করে আমার কাছে আসিস।'

ঝুনুকে বাউলদার বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নের কথা বলল লালটু।

অবাক হয়ে সেই স্বপ্নের কথা শুনল ঝুনু। ভাবতে লাগল।

তেমাথার মোড়ে গদাধর মোক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের।

গদাধর মোক্তার পান-বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটা কে রে লালটু ?

লালটু বলল, 'আমার বোন।'

—তোর বোন! সে কিরে! সৎ বোন নাকি ?

এমন খিঁক্ খিক্ করে হাসলেন গদাধর যে বিচ্ছিরি লাগল লালটুর। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাইল সে।

গদাধর বললেন, আরে দাঁড়া দাঁড়া, রাগ করিস না। তোর বোনের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করি—

বলতে বলতে রাস্তা পেরিয়ে লালটুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন গদাধর। তিনি খেয়াল করেন নি ঠিক সেই সময়ই এ অঞ্চলের সর্বজন পরিচিত ভোলা নামে ষাঁড়টি কাদের যেন তাড়া খেয়ে ছুটে আসছিল রাস্তা দিয়ে।

ভোলা প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছিল মোক্তারের। হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভোলার শিং-এর গুঁতো থেকে রক্ষা পেতে পেছন ফিরে লাফ মারলেন মোক্তার এবং সেই লাফে গিয়ে পড়লেন রাস্তার পাশের বড় নর্দমাটার মধ্যে।

ছুটে চলে গেল ভোলা। কিন্তু নর্দমার পাঁকের মধ্যে থেকে সহজে উঠতে পারলেন না গদাধর মোক্তার। নর্দমার পাঁকে চেনা যাচ্ছিল না ওকে।

যে তু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাস্তায় তারা হাসছিল সবাই।

হাসি পেয়েছিল লালটুরও। কিন্তু হিতকারী সংঘের কথা মনে হতেই হাসির দমক সামলালো সে।

নর্দমার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল লালটু। সেই হাত ধরে অনেক কষ্টে উঠলেন গদাধর মোক্তার। তবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না তিনি। পায়ে লেগেছে তাঁর, ভেঙ্গেছে কি না বুঝতে পারছেন না।

লালটু আর ঝুনু তাঁকে ধরে রাস্তার কলে নিয়ে গেলো। কল পাম্প করল লালটু। সেই জলে গা-হাত-পা-জামা-কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার হলে মোক্তার। কিন্তু ঠিক মতো হাঁটতে পারলেন না কিছুতেই।

লালটু আর ঝুনুকে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিমাই ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গেলেন তিনি।

নিমাই ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, 'মনে হচ্ছে ভাঙে নি। বাড়িতে গিয়ে চুন-হলুদ গরম করে লাগান, আর এই ট্যাবলেটটা লিখে দিচ্ছি দিনে ছ'বার করে খান।'

গদাধর বললেন, 'ট্যাবলেট না হয় খাব, কিন্তু চুন-হলুদ গরম করে লাগাব কি করে?'

নিমাই ডাক্তার বললেন, 'বৌদিকে বলবেন, লাগিয়ে দেবে।'

'—তিনি তো কাল ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। তিন চার দিন পরে ফিরবেন। যা হোক করে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খাচ্ছি কোন মতে, এখন কি গেরোয় পড়লাম রে বাবা।'

ঝুনু বলল, 'আপনি ভাববেন না কাকাবাবু, আমি লাগিয়ে দেব।'
গদাধর বললেন, 'তুই কি করে পারবি?'

—আপনি দেখবেন আমি ঠিক পারব। আমার কাকীর একবার পা মচকে গেছিল, আমিই তো তাঁকে চুন-হলুদ লাগিয়ে দিতাম।

একটা রিক্সা ডেকে আনল লালটু।

সেই রিক্সায় চেপে গদাধর মোক্তারের সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেল লালটু—ঝুনু। এবং গদাধর মোক্তার আর লালটুকে অবাক করে দিয়ে চুন-হলুদ গরম করে সত্যিই সুন্দর করে লাগিয়ে দিল ঝুনু। সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকবার লাগাতেই আরাম বোধ করলেন মোক্তার।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হিতকারী সংঘের অন্যান্য সদস্যরা এসে উপস্থিত হয়েছিল মোক্তার বাড়ি।

তারা কেউ গিয়ে মোক্তারের বাজার করে নিয়ে এলো। আবার

কেউ গিয়ে মোক্তারের মক্কেলদের বাড়ি গিয়ে জানিয়ে এলো মোক্তার কাল কোর্টে যেতে পারবেন না।

খুব খুশী হলেন গদাধর মোক্তার। আশীর্বাদ করলেন ঝুনুকে। আশীর্বাদ করলেন হিতকারী সংঘের সকলকে।

পরদিন সকালে আবার সকলে যখন তাঁর কাজ কর্ম করে দিতে তাঁর বাড়িতে গেল মোক্তার বললেন, 'তোদের হিতকারী সংঘের জন্য আমার এই পাঁচটা টাকা চাঁদা রেখে দে।'

গদাধর মোক্তার টাকা দিচ্ছেন দেখে অবাক সকলে। কারণ গদাধর মোক্তার কখনো কাউকে চাঁদা দেন না। এমন কি পাড়ার বারোয়ারী পূজোতেও না। তিনি যে না চাইতেই একেবারে পাঁচ-পাঁচটা টাকা চাঁদা দেবেন এ ব্যাপারটা কেউ নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবে না।

লালটু বলল, 'এখন চাঁদা লাগবে না আমাদের। যখন লাগবে তখন নেব।

গদাধর বললেন, 'একটা সংঘ চালাতে ফাণ্ড দরকার হয়, বুঝলি? এখন এটা রেখে দে। পরে আবার যখন লাগবে আবার দেব।'

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, সে তো আপনার কাছে থাকলেই হতো।'

ফুচকার ধ্যুৎ কালা শুনে চমকে উঠলেন মোক্তার। বড় চোখ করে তাকালেন তার দিকে।

লক্ষ্য করল লালটু। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না কাকা। ধ্যুৎ কালা বলা ফুচকার মুদ্রা দোষ।'

ল্যাঠা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ওকে আমরা ক-ক-কদিন ব-ব-বলেছি তবু বলবে।'

শান্টু বলল, 'তোকেও তো কদিন বলেছি তোতলাবি না—'

হাসলেন গদাধর! বললেন, 'এক একজনের অমন থাকে। আমাদের গঙ্গা উকিল তো এখনো কথায় কথায় বলেন 'মার্ ঝাঁটা।'

মাঝে মাঝে জজ সাহেবকেও 'মার্ ঝাঁটা' বলেন তিনি। নতুন কোন জজ্ এলে তাই আগে থেকেই তাঁকে ওঁর মুদ্রা দোষটা জানিয়ে রাখেন গঙ্গা উকিল। একবার কি হয়েছিল জানো—একটা খুনের আসামীকে জেরা করতে করতে বারবার 'মার্ ঝাঁটা' বলছিলেন গঙ্গা উকিল। খুনের আসামী তো শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে কাঠগড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে গঙ্গা উকিলের গলা টিপে ধরল। অনেক কষ্টে সেবার গঙ্গা উকিলকে বাঁচিয়েছিল সকলে। তবু তিনি আজও 'মার্ ঝাঁটা' বলা ছাড়তে পারেন নি···'

হাসতে লাগলেন গদাধর মোক্তার। হাসতে লাগল সকলেই!

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, তাহলে আমার আর দোষ কি?'

আবার হেসে উঠল সকলে।

পরপর দুটি ঘটনায় হিতকারী সংঘের সদস্যদের উৎসাহ বেড়ে গেল। আর সংঘের সুনামও একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সব চাইতে বেশি সুনাম ছড়াল পণ্ডিত মশায়ের ঘটনায়।

পণ্ডিত মশায়ের অভ্যাসই ছিল সকলের খুঁৎ ধরা। তাঁর মুখ থেকে কেউ কখনো কারো সুখ্যাতি শোনে নি। এমন কি স্কুলের বেস্ট বয়ও নয়। সেই পণ্ডিতমশাই একদিন প্রশংসা করে বসলেন হিতকারী সংঘের।

ক'দিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পণ্ডিত মশাই।

বয়স্ক মানুষ। একা থাকেন। নিজে রান্না করে খান।

ওঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শাণ্টু আর ফ্যালা গিয়েছিল ওঁর ঘরে। আর সকলে অপেক্ষা করছিল বাইরে।

তখন জ্বরে কোঁকাচ্ছিলেন পণ্ডিতমশাই। কোঁকাতে কোঁকাতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি চাই তোদের?'

—আমরা হিতকারী সংঘের সদস্যরা আপনার সেবা করতে এসেছি স্যার। বলেছিল শাণ্টু।

—আমার সেবা করতে! ফাজিল, বদমায়েস ছোকরা কান ছিঁড়ে হাতে দিয়ে দেব। কোঁকাতে কোঁকাতে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠেছিলেন পণ্ডিতমশাই।

—ধমক খেয়ে শাণ্টু মনে মনে শিঁটিয়ে গেলেও অনেক করে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করেছিল 'কেন স্যার?'

—কেন আবার! আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো সেদিন খেয়ে লোভ বেড়ে গেছে? এখন এসেছিস দুই বন্ধুতে মিলে চুরি করতে? বেরো, বেরো বলছি হারামজাদা, আভি নিকালো। নেহি তো পুলিশকে ডাককে ধরিয়ে দেগা—

পণ্ডিতমশাই রেগে গেলে হিন্দী বাংলা মিশিয়ে ফেলেন। রাগে চিৎকার করে কোঁকাতে লেগেছিলেন তিনি।

শাণ্টু সম্বন্ধে যা বলেছিলেন পণ্ডিতমশাই তা অবশ্য সত্যি।

পণ্ডিত মশাই বিনে পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেন অনেককেই। অবশ্য উনি ডাক্তার না। বই পড়ে পড়ে ওষুধ দেন গরীবদের। ওঁর একটা কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্সে ছোট ছোট শিশিতে ছোট্ট ছোট্ট সাবুদানার মতো ওষুধ থাকে। একদিন ঘর খোলা পেয়ে সব ওষুধগুলো খেয়ে ফেলেছিল শাণ্টু। পণ্ডিতমশাই নিজে চোখে না দেখলেও সন্দেহ করেছিলেন শাণ্টুকে। আর তাঁর সন্দেহটা যে মিথ্যে নয় তা প্রমাণ হয়েছিল। সেই থেকে শাণ্টুকে দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন পণ্ডিতমশাই।

শাণ্টু-ফ্যালা পণ্ডিত মশায়ের ধমক খেয়ে বেরিয়ে আসার পর সকলে ভাবতে বসেছিল কী করে সেবা করা যায় তাঁর। কেউ সাহস পাচ্ছিল না সদারাগী পণ্ডিতমশায়ের ঘরে যেতে।

শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়েছিল ঝুনুই।

লালটু আর ঝুনু যখন পণ্ডিতমশায়ের ঘরে গিয়েছিল তখন প্রায় বে-হুঁশ অবস্থা তাঁর।

ছোটাছুটি শুরু করেছিল হিতকারী সংঘের সদস্যরা।

বন্ধু ডাক্তারকে ডেকে আনা, মাথায় জল ঢালা, সময় মতো ওষুধ খাওয়ানো কোনো কিছুতেই ত্রুটি রাখে নি তারা।

উনোনে আঁচ দিয়ে দুধ-সাবু জ্বাল করে, রুটি করে, অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করে সকলকে অবাক করেছিল ঝুনু।

পণ্ডিত মশায়ের মুখে আর ধমক-ধামক ছিল না। তার পরিবর্তে শুধু আশীর্বাদ আর প্রশংসা। তাঁর কথায় এমন ছেলে-মেয়ে ভূ-ভারতে দেখেন নি তিনি। আর ঝুনু! তার মতো মেয়ে হয় না, তাকে বিনে পয়সায় পড়াবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ওই ঘটনার পর একদিন পার্কে বসে ফুচকা বললে, 'হিতকারী সংঘের ওপর শনির দৃষ্টি কেটে গেছে।'

ফুচকার বাবা জ্যোতিষী, তাই ফুচকাও মাঝে মাঝে জ্যোতিষীর মতো কথা বলে।

ফ্যালা জিজ্ঞেস করলে, 'শনির দৃষ্টি কি রে?'

ফুচকা বলল, 'সে তুই বুঝবি না। তবে এটুকু জেনে রাখ শনির দৃষ্টি যার ওপর পড়ে সে একেবারে ভস্ম হয়ে যায়। আমাদের সংঘের ওপরও তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল তাই আমরা বারবার বিপদে পড়ছিলাম। এখন তাঁর দৃষ্টি কেটে গেছে। ধ্যৎ কালা, এখন আমাদের বৃহস্পতি তুঙ্গে।'

'বৃহস্পতি তুঙ্গে'টা কি বুঝল না কেউ। তবে ভেবে নিল এখন হিতকারী সংঘের সময়টা ভাল।

লালটু বলল। 'ঝুনুর জন্যই বৃহস্পতি তুঙ্গে হয়েছে। ও আসার পর থেকেই আমরা প্রশংসা পেতে শুরু করেছি।'

সকলেই সমস্বরে সমর্থন করল লালটুর কথা।

ঝুনু ধূলো মাটি দিয়ে ঘর বানাচ্ছিল আপনমনে। সে বলল, ওসব কথা বললে কিন্তু আমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে তোমাদের।'

—কেন, কেন?

—আমরা সকলে মিলে ভাল কাজ করছি বলেই হিতকারী সংঘের নাম হয়েছে।

—বেশ, বেশ তাই। বলল লালটু।

ল্যাঠা বলল, 'তা-তাহলে হিতকারী সংঘের নামে জি-জি জিন্দাবাদ হোক একবার।'

সঙ্গে সঙ্গে শাণ্টু দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, হিতকারী সংঘ—'

সকলে বলল, 'জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ।'

তারপর শাণ্টু বলল, 'একটা সু-খবর দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

—কি সুখবর?

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সকলে।

—আমার বাবাকে বাউলদা বলেছেন ঝুনুর কাকা-কাকীর কাছে গিয়েছিলেন বাউলদা—

এটুকু বলে একটু থামল শাণ্টু।

ঝুনুর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

—তারপর বল্ না—তাড়া দিল লালটু।

—ঝুনুর কাকা-কাকী বলেছে বাউলদার কাছে ঝুনুকে রাখতে আপত্তি নেই তাদের।

ঝুনুর বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল।

ওর মনে হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে তার নতুন বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে। চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তোলে।

এবার সকলে চিৎকার করে উঠল 'বাউলদা—জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ।'

এতক্ষণ হেবো ছিল না ওদের মধ্যে।

তাকে দেখা গেল কলাপাতায় মুড়ে কী যেন নিয়ে আসছে।

—কলাপাতায় কিরে? জিজ্ঞেস করল ফ্যালা।

হেবো বলল 'আচার। আমি নিজে করেছি। ঝুনু সেদিন বলছিল কিনা তেঁতুলের আচার খেতে ওর খুব ভাল লাগে তাই—'

ঝুনু বলল, 'তুমি আচার তৈরী করতে জানো।'

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। ছাখ্ না কেমন হয়েছে। যা রঙ হয়েছে —দারুণ।

ঝুনু কলাপাতার মোড়কটা খুলল। বলল, 'হেবোদা, তেঁতুলের আচার এমন হল্‌দে হয়েছে কেন?'

হেবো বলল, 'হলুদ দিয়েছি যে।'

—হলুদ দিয়ে তেঁতুলের আচার আমি কোনদিন খাই নি।

—খেয়ে ছাখ্ সকলে মিলে একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ।

শাণ্টু বলল, 'কি ভাবে করলিরে হেবো? একটু শিখিয়ে দে না—

হেবো বলতে লাগল, 'বিচি ছাড়ানো তেঁতুলকে আগে কিছুক্ষণ রোদ খাওয়াবি। তারপর মাছে যেমন হলুদ মাখায় তেমনি ভাবে পরিমাণ মতো হলুদ মাখিয়ে আবার কিছুক্ষণ রোদে রাখবি। এবার পনেরো মিনিট বাদে লঙ্কা গুড়ো, নুন, গুড় বা চিনি আর জিরে দিয়ে মেখে রোদে দিবি। যত বেশি রোদ পাবে ততই ভাল। সবশেষে গোল-মরিচগুড়ো ছড়িয়ে দিবি—

বেশ ভারিক্কি চালে তেঁতুলের আচার করার কায়দা কানুন বর্ণনা করল হেবো। তারপর বলল, নে-নে এবার খেয়ে ছাখ কেমন করেছি।

সবাইকে আচার ভাগ করে দিল ঝুনু।

খাবার জিনিস হাতে পেলে তর সয় না ল্যাঠার। যে কোন জিনিস বেশী করে মুখে পুরে দেওয়া অভ্যাস তার। সে-ই প্রথম চেঁচিয়ে উঠল।

—ঝা-ঝা-ল, হ-হ-হলুদ—তে-তেতো—

ঠিক কী যে বলতে চাইল ল্যাঠা বোঝা গেল না।

বোঝা গেল লালটুর কথায়—এটা কিরে, নুন দিস নি, হলুদ গন্ধ ইস্ অ্যাঃ,—ঝাল—

—নুন দিতে ভুলে গেছি বোধ হয় তাই অমন লাগছে। দাঁড়া, মুদীর দোকান থেকে নুন নিয়ে আসি।

উঠতে যাচ্ছিল হেবো।

জামাটা টেনে ধরল শাণ্টু। বলল, 'আর নুন লাগবে না—এটা একটা বিষ তৈরী হয়েছে।

ঝুনু বলল, 'উঃ, কী ঝাল দিয়েছ হেবোদা। হলুদ কাটা হয়েছে।

—ওটা খাস নে, খেলে পেটের অসুখ করবে। ফেলে দে ঝুনু, ফেলে দে।

ঝুনু চেষ্টা করছিল খেতে। ওর হাত থেকে কলাপাতাটা ফেলে দিল ফ্যালা। বলল, 'ইস্, কী ডাঁটের মাথায় আচার তৈরী শেখাচ্ছিল। উঃ, মুখ জ্বলে গেল মাইরি।'

সকলেই ছুটল কলের দিকে।

নিজেকে বোকা বোকা লাগতে লাগল হেবোর। সারা দুপুর ছাদে বসে আচারটা তৈরী করেছিল সে। কিন্তু খেতে পারল না কেউ। সত্যিই কি খুব খারাপ হয়েছে!

সকলে কলের দিকে গেলে কলাপাতায় লেগে থাকা আচার থেকে একটু মুখে দিয়ে নিজেই থু-থু করল সে। ভাবল ফর্মুলার কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে। আগে নিজেরই একবার চেখে দেখা উচিৎ ছিল।

কল থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে আসার পরেও হয়তো কিছুক্ষণ হেবোকে নাস্তানাবুদ করত সকলে যদি না শাণ্টুর মাথায় সেই সময় একটা প্ল্যান আসত।

মুখ ধুতে ধুতে হঠাৎ রথের মেলার কথা মনে এলো শাণ্টুর। গতবার রথের মেলায় লঙ্কার আচার কিনে খেয়েছিল সে। খুব ভাল আচার।

কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে ফিরে এসে শাণ্টু বলল, 'আমি একটা

কথা ভাবছি। এবারের রথের মেলায় একটা জলদান কেন্দ্র করলে কেমন হয় ?

ফুচকা বলল, 'সেই সঙ্গে একটা অনুসন্ধান অফিস—'

লালটু বলল, 'গুড্ আইডিয়া।'

—কিন্তু অনুসন্ধান অফিস করতে তো মাইক লাগবে। মাইকের কি হবে ? বলল ফ্যালা।

ল্যাঠা বলল, 'জ-জল দিতেও তো কলসী-বালতি ঘটি লাগবে—'

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মোক্তার কাকুর অনেক জানাশোনা লোক আছে। মক্কেল আছে। একটু বলে দিলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কথাটা মন্দ বলেনি ফুচকা।

ওরই পরামর্শমতো গদাধর মোক্তারের বাড়িতে গিয়ে হিতকারী সংঘের প্ল্যানের কথা বলল লালটু।

গদাধর মোক্তার শুনে বললেন, 'উত্তম কাজ। বিশেষ করে তৃষ্ণার্তকে জলদান। তোদের কিছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা করে দেব আমি।'

হ্যাঁ, গদাধর মোক্তারই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর এক মক্কেল মাইক দিল। আর এক মক্কেল জল রাখার জন্য দু'টো জালা দিল। লালটু-ফ্যালা দুটো বালতি নিয়ে এলো বাড়ি থেকে। ল্যাঠা-হেবো দুটো জগ আনল।

এখানকার রথের মেলাটা বেশ বড়ই হয়। দূর দূর গাঁ থেকে লোক আসে মেলায়। অনেক লোক। কিন্তু জল খাবার টিউব-ওয়েল একটিই, তাই জল খাবার লোকের অভাব হল না। জল পড়ে পড়ে জায়গাটা এমন হল যে কয়েকজন তো আছাড় খেয়ে কাদা মেখে একাকার। তবু জল খাবার লোকের লাইন। জল বয়ে আর জল দিয়ে শেষ করতে পারছিল না ঝুনু-হেবো-লালটু-শাণ্টু।

কিন্তু একটিও লোক ছিল না অনুসন্ধান অফিসে। ল্যাঠা, ফুচকা,

ফ্যালা হাঁপিয়ে উঠছিল বসে বসে। ওরা যে জলদান কেন্দ্রে যাবে তারও উপায় নেই। কারণ যখন দুটো দল তৈরী হয়েছিল তখন অনুসন্ধান অফিসে থাকতে চেয়েছিল ওরা।

ফ্যালা সেই একই কথা চেঁচিয়ে যাচ্ছিল মাইকে। যদি কেউ হারিয়ে গিয়ে থাকেন অথবা কারো সন্ধান চান তবে দয়া করে অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। যদি কেউ হারিয়ে গিয়ে থাকেন, অথবা কারো সন্ধান চান তবে দয়া করে অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। যদি কেউ—

ফুচকা বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল ফ্যালাকে।—থাম তো, ভাল লাগছে না। কী লোকগুলো বল্ তো কেউ হারাচ্ছে না?'

যখন কথা বলছিল ফুচকা ঠিক তখনই ল্যাঠার নজর পড়ল একটা সাত আট বছরের ছেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর হাতের কাঠি আইসক্রীমটা ঘন ঘন মুখে পুরছে, টেনে বের করছে।

ল্যাঠা বলল, দ্যা-দ্যাখ্ ওই ছেলেটা নি-নিশ্চয় হারিয়েছে।'

ফ্যালা সঙ্গে সঙ্গে মাইকে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই লাল জামা পরা আইসক্রীম খাওয়া খোকা; তুমি কি হারিয়ে গেছো?

মাইকে কথাটা শুনে তাকাল ছেলেটা।

ফুচকা তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল ছেলেটার দিকে।

ছেলেটা তাকে দেখে ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু তার আগেই ফুচকা ধরে ফেলল তার হাতটা।

সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করল ছেলেটা। ফুচকা যত বলে, 'কাঁদিস না। আমরা তোকে তোর বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে দেব।' ততই আরো জোরে কাঁদে ছেলেটা।

ওদের ঘিরে ভিড় জমে গেল।

ফ্যালা ভাবতে লাগল কী বলা যায় মাইকে।—লাল জামা পরা ছেলে, নাম বলতে পারছে না, কাঁদছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে মেলায় এসেছিল—

না, আর ভাবতে হল না ফ্যালাকে। কারণ কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটা যা বলল তা হচ্ছে—সে থাকে পাশের গাঁ মোহনপুরে। বাবা-মা মেলায় আসতে চায় নি বলে সে লুকিয়ে মেলায় এসেছে। সে নিজেই বাড়ি যেতে পারবে। অন্য কেউ নিয়ে গেলে ফাঁস হয়ে যাবে তার মেলায় আসার কথা। তাহলে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে ফেলবে মা।

ল্যাঠা ধমকে উঠল ছেলেটাকে। বলল,—'যা-যা বাড়ি যা।'

তারপর অনুসন্ধান কেন্দ্রে ফিরে এসে বলল, 'যা-ও একটা কেস পাওয়া গেল, তাও বাজে।'

তবে একটু পরেই সত্যি-সত্যিই একটা 'কেস' পেল ওরা।

স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল নতুন বৌ। এখন খুঁজে পাচ্ছে না স্বামীকে।

ফ্যালা গম্ভীর ভাবে বলল, 'নাম আর গ্রামের নাম বলুন।'

বৌটি বলল, 'জয়পুর লক্ষ্মীমণি দাসী।

—আপনার নাম নয়, স্বামীর নাম বলুন।

—স্বামীর নাম কি হিন্দুর মেয়েরা বলে? জিব্ কাটল বৌটি।

—ও, তাহলে?

ল্যাঠা বলল, 'কাগজে লিখে দিন।'

বৌটি বলল, 'কাগজে লিখতে জানিনা যে।'

সমস্যায় পড়ল ল্যাঠা, ফুচকা, ফ্যালা।

শেষ পর্যন্ত ফ্যালা মাইকে ঘোষণা করল, 'একজন স্বামী হারিয়ে গেছেন, বৌ খুঁজছেন।'

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা ঠিক করে বল।'

এবার ফ্যালা বলল, 'থুড়ি—একজন বৌ হারিয়ে গেছেন, স্বামী খুঁজছেন। স্বামীজী দয়া করে আসুন।

ল্যাঠা বলল, 'ঠিক বলা হল না। স-সর্ আমি বলছি।'

ল্যাঠা বলল, 'হে-হে মেলার দর্শকগণ, লক্ষ্মীমণি দা-দাসী হারিয়ে

গেছেন, স্বা-স্বামী খুঁজছেন। কেউ যদি তাঁদের খ-খবর জানেন অনুসন্ধান অ-অফিসে খ-খ-খবর দিন।'

ফুচকা বলল, ধ্যুৎ কালা, কী যা-তা বকছিস তোরা? সর, আমি বলি।—আপনারা ধ্যুৎ কালারা শুনুন—জয়পুরের স্বামী হারিয়ে গেছেন মেলার মধ্যে, লক্ষ্মীমণি দাসী হারিয়ে গেছেন অনুসন্ধান অফিসে। জয়পুরের লক্ষ্মীমণি দাসী তাড়াতাড়ি আসুন স্বামীর কাছে।

ল্যাঠা, ফুচকা, ফ্যালার অদ্ভুত অদ্ভুত ঘোষণা শুনে ছুটে এলো লালটু।

সে মাইকে বলতে যাবে এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল লক্ষ্মীমণি দাসীর স্বামী।

তখন ল্যাঠা, ফুচকা, ফ্যালা—সকলেই দাবী করতে লাগল তার ঘোষণা শুনেই লক্ষ্মীমণির স্বামী ছুটে এসেছেন।

তর্ক বেধে গেল নিজেদের মধ্যে।

সেই তর্ক হয়তো ঝগড়াতেই রূপান্তরিত হতো যদি না সেই সময় আর একটি লোক এসে উপস্থিত হতো।

সেই লোকটি এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'খোকাবাবুরা আমার মাণিককে খুঁজে দাও গো। হা-হায় কী কুক্ষণেই মেলায় এসেছিলাম গো—

ফ্যালা বলল, চিন্তা করবেন না, আমরা যখন আছি আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনার মাণিকের বয়স কত?

লোকটি বলল, 'আমি কি অত হিসাব নিকাশ জানি গো খোকাবাবুরা?

—তবু একটা আন্দাজ বলুন।

—তা চার-ছয় হবে কি নয় হবে।

তা হলে খুব বাচ্চা। বেশ, আপনার নাম বলুন।

—আমার নাম ভগবান চরণ দাস। আঁজ্ঞে খোকাবাবুরা, আমার মাণিককে কেউ ধরে নিয়ে যায় নি তো?

ল্যাঠা বলল, 'আ-আ আপনি স্থির হয়ে বসুন। এখুনি মাইকে ঘোষণা হবে।'

ফ্যালা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে একটু ভেবে চিন্তে মাইকে ঘোষণা করল, 'মাণিক, তুমি যেখানেই থাক অনুসন্ধান অফিসে চলে এসো। তোমার বাড়ির লোক অনুসন্ধান অফিসে বসে আছেন।

মাণিক—মাণিক, তুমি যেখানেই থাক—

ফ্যালার বারবার ঘোষণাতেও এলো না মাণিক।

ফ্যালার পর ল্যাঠা, তারপর ফুচকা একই কথা ঘোষণা করল। কিন্তু না কোন কাজ হল না।

তখন ভগবান চরণ দাস বলল, 'খোকাবাবুরা, আমি একবার মাণিককে ডাকব মাইকে ?

—ডাকুন। বলল ল্যাঠা।

মাউথপীসের সামনে দাঁড়িয়ে ভগবান চরণ ডাকতে লাগল—মাণিক, মাণকে আয়-আয় তু-তু-তু—তু-উ-উ, তু-উ-উ—

ভগবান চরণের 'তু' ডাকে চমকে উঠল ল্যাঠা, ফ্যালা, ফুচকা। ফ্যালা বলল, 'অমন তু-তু করছেন কেন ?

ভগবান চরণ বলল, 'মাণকে অনেক সময় নাম ধরে ডাকলে আসে না। তু-তু-করে ডাকলে ন্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে আসে।

—ও-ওই যে আসছে। ওই আসছে আমার মান্‌কে।

ছুটল ভগবান চরণ।

ল্যাঠা, ফ্যালা, ফুচকা দেখল একটা কালো রোগা কুকুরকে জড়িয়ে ধরেছে ভগবান চরণ।

শান্টু কল থেকে জল ভরা বালতি নিয়ে যাচ্ছিল। একটু দাঁড়িয়ে বলল, 'আগে জেনে নিবি তো কুকুর না মানুষ হারিয়েছে'।

ফুচ্‌কা বলল, ধ্যুৎ কালা অত জ্ঞান দিস না, তোদের জল দেওয়ার চাইতে আমাদের কাজের গুরুত্ব অনেক বেশী।

শাণ্টু হেসে বলল, 'সেইজন্যই তো লোকে আমাদের ধন্য ধন্য করছে, তোদের নামও বলছে না কেউ।

কিন্তু অনুসন্ধান কেন্দ্রের ছেলেদের যে গুরুত্ব কম নয় তা প্রমাণ করে দিল ফুচকারা।

শ্যামচকের দুর্গা জানা ছোট নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল মেলায়। তারপর ভিড়ের মধ্যে হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল ওদের। নাতনীকে খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল দুর্গা জানা।

সেই নাতনীকে ওরা খুঁজে বের করল তেমাথার কাছ থেকে। একটা লোকের পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছিল সে। লোকটা নাকি তাকে সন্দেশ কিনে দিয়েছিল।

ফুচকা আর ল্যাঠা গিয়ে যখন হাত ধরেছিল মেয়েটির তখনই দেখেছিল একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে।

এই ঘটনায় হৈ-হৈ পড়ে গেল মেলায়। হৈ-হৈ পড়ে গেল হিতকারী সংঘের নামেও। ধন্য ধন্য করতে লাগল সকলে।

এরপর একদিন সকলের জন্য তেঁতুলের আচার করে নিয়ে এলো ঝুনু। তার নতুন মা ভবানীর কাছ থেকে শুনে শুনে আচার তৈরী করেছে সে।

সুন্দর হয়েছে আচারটা। টক টক, ঝাল ঝাল, মিষ্টি মিষ্টি, নুন নুন।

সেই আচার খেয়ে কেউ কিছু বলার আগেই নিজের কান দুটো ধরে দুবার ওঠ-বোস করে নিল হেবো। বলল, 'আর কোনদিন ভুলেও আচার করতে যাব না।"

হেবোর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল সকলে।

শাণ্টু বলল, 'যাদের যা কাজ তাদেরই মানায়। আচার-টাচার করা, রান্না বান্না করা মেয়েদের কাজ—তাই মেয়েরাই ভাল পারে।'

আচার খাওয়া হয়ে গেলে লালটু বলল, 'হ্যাঁরে ঝুনু, মণ্ডিতমশাই বলছিলেন তুই নাকি ক'দিন পড়তে যাচ্ছিস না?'

ঝুনু বলল, 'ক'দিন যাই নি বানানের জন্যে।'

—কি বানান ?

—অনেক বানান। শুধু ভুল হয়ে যাচ্ছে বানানগুলো। বানানগুলো ঠিক মতো মুখস্থ করে তবে যাব। আচ্ছা দাদা—যদি ই-কার ঈকার দুটো না হয়ে একটা ইকার হতো, যদি মূর্ধন্য ণ দন্ত্য ন দুটো না হয়ে শুধু একটা ন হতো, যদি উ ঊ দুটো না হয়ে একটা উ হতো, আর যদি দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ তালব্য শ তিনটি না হয়ে একটা স হতো তাহলে কি এমন ক্ষতি হতো বল তো ?

ফ্যালা বলল, 'আমারও সেই কথা। কী যে সব বই লিখেছে মানে হয় না।'

ল্যাঠা বলল, 'য্যা-য্যা য্যামন ইংরেজী তেমনি বা-বা বাংলা। স-স সব বইগুলো নতুন করে লেখা উচিৎ।'

ওদের আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টে যাচ্ছিল বারবার।

একসময় হেবো বলল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয় ?'

লালটু জিজ্ঞেস করল, 'কি কাজ ?'

—অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর পুরোনো বই যোগাড় করে যদি আমরা গরীব ছেলেদের দিই তাহলে কেমন হয় ?

—খুব ভাল হয়।

ল্যাঠা বলল, 'আমার কাছে অনেক পুরোনো বই আছে।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, আমার কাছেও আছে।'

শান্টু বলল, 'আগে সব বই একত্র করে বুক লিস্ট মেলাতে হবে।'

হেবো বলল, 'তারপর কয়েকটা পোস্টার টাঙিয়ে দিলেই হবে।'

ঝুনু বলল, 'সকলে কি এই গাছতলায় আসবে বই নিতে ?

—আগে একটা ঘর দরকার। বলল লালটু।

—একটা ঘর পেলে আমরা গরীব ছেলেদের পড়াতেও পারি। বলল ফ্যালা।

—কে পড়াবে ?

—আমরাই পড়াব বিকেলবেলা।

ঝুনু বলল, 'তাহলে আর পণ্ডিতমশায়ের কাছে যাব না আমি। তোমাদের কাছেই পড়ব।

ল্যাঠা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'দা-দারুণ হবে। আ-আমরা বেশ মাস্টার হব। সকলে আমাদের স্যা-স্যার বলে ডাকবে।'

হেবো বলল, 'কিন্তু যদি উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে ছাত্ররা তখন কি হবে ?'

লালটু একটু চিন্তিত মুখে বলল, 'থাম তো। একটা ঘরই পাওয়া গেল না তার আগেই যত উদ্ভট চিন্তা।'

ফ্যালা বলল, 'ওই তো হয়েছে মুস্কিল, আমাদের কারো বাড়িতে একখানাও ফাঁকা ঘর নেই।

শান্টু বলল, 'আগে সবাই মিলে খবর নিই কার বাড়িতে ফাঁকা ঘর আছে তারপর গিয়ে না হয় তাকে ধরব।'

ক'দিন ধরে হিতকারী সংঘের সভ্যরা যখন একটা বিনে পয়সার ঘর খুঁজছে তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

সকলের কাছেই সে এক অদ্ভুত ঘটনা।

যোগেশ্বর রায় ওরফে রায়কত্তার বাড়িতে হঠাৎ তার গুরুদেব স্বামী কিম্ভূতানন্দ এসে উপস্থিত হলেন।

এই অঞ্চলে স্বামী কিম্ভুতানন্দের অনেক শিষ্য।

শিষ্যরা দলে দলে গুরুদেবের জন্য মিষ্টি, ফল মূল নিয়ে হাজির হতে লাগল রায় বাড়িতে।

হাজির হয়ে গেল হিতকারী সংঘের সদস্যরা।

বড় বড় কাঠের বারকোষে মিষ্টি, ফল মূল সাজিয়ে রাখা, ঘরদোর নোংরা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, কুকুর টুকুর কোথাও ঢুকে না পড়ে সেদিকে দেখা, শিষ্যদের প্রয়োজন জেনে তার ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি কাজকর্ম রায় কত্তার নির্দেশমতো করতে লাগল তারা।

ভেতরের লম্বা ঘরখানায় একটা উঁচু জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল স্বামীজীর জন্য। স্বামীজী উপদেশ দিচ্ছিলেন শিষ্যদের।

ক্ষিদে পাচ্ছিল ফুচকার। বারকোষ ভর্তি সন্দেশগুলো যখনই তার চোখে পড়ছিল তখনই ক্ষিদের পোকাটা দারুণভাবে নড়াচড়া করতে শুরু করেছিল পেটের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে কয়েকটা সন্দেশ মুখে পুরে দিল ফুচকা। কিন্তু কারো দেখে ফেলার ভয়ে সন্দেশগুলো তাড়াতাড়ি গিলতে গিয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল তার।

শাণ্টু লক্ষ্য করেছিল সব। তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে ফুচকাকে বাঁচাল সে।

জল খেয়ে সুস্থ হতে ফুচকাকে চাপা গলায় ধমকে উঠল শাণ্টু।

—তুই আমাদের নাম ডোবাবি ফুচকা। একটু লোভ সামলাতে পারিস না!

—না—মানে—

—হয়েছে, হয়েছে আর মানে বোঝাতে হবে না। গেট আটকাবি চল। রায়কত্তা বললেন ভিখিরীরা নাকি ঢোকার চেষ্টা করছে। বলল শাণ্টু।

ওরা গেটের কাছে এসে দেখল কয়েকটা ভিখিরী ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে গেটের সামনে। বোধ হয় ওদের ধারণা ভেতরে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে।

ফুচকা আর শাণ্টু ভিখিরী ছেলেমেয়েদের গেটের কাছ থেকে সরে যেতে বলতে না বলতেই দেখতে পেল ঝুনু আর লালটু একটা মিষ্টি ভর্তি বারকোষ বয়ে নিয়ে আসছে।

বারকোষটা নামিয়ে দু'হাত ভর্তি মিষ্টি নিয়ে ভিখিরীদের দিতে লাগল ঝুনু।

এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ডতে হৈ-চৈ পড়ে গেল ভিখিরী ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

সেই হৈ-চৈ-য়ের মধ্যে শান্টু লালটুকে জিজ্ঞেস করল, 'রায়কর্ত্তা কি ওগুলো ওদের দিতে বলেছে ?'

লালটু বলল, 'না, দিতে বলে নি। তবে ঝুনু বলল এত মিষ্টি তো স্বামীজী একা খেতে পারবেন না, তাই—

শেষ হল না লালটুর কথা। দেখা গেল পড়ি মরি করে ছুটে আসছেন রায়কর্ত্তা।



উনি এসেই পরপর দুটো চড় কষিয়ে দিলেন ঝুনুর গালে।

—এটা কি তোর বাপের জিনিস পেয়েছিস ? কে তোকে মিষ্টি

দিতে বলেছে? যা, তোরা বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। কারো দরকার নেই আমার—রাগে গর্জাতে লাগলেন রায়কত্তা।

লালটু শান্টুর মনে হল রায় কত্তাকে যা-তা বলে দেয়।

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না ওরা। থমকে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সকলে মিলে বেরিয়ে এলো রায় বাড়ি থেকে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা গেল বাউল বাড়ি।

সব শুনল হরি। দেখল ঝুনুর গালে আঙুলের দাগ। ক্ষোভে-দুঃখে কান্না পেল তার।

কান্না পেল ভবানীরও। মেয়ের গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ইস্ কী পাষণ্ড রায়কত্তা। একটু মায়া দয়াও নেই ওঁর শরীরে। তুই আর ওসবের মধ্যে যাসনে মা।'

ঝুনু বলল, 'আমার একটুও লাগে নি মা।

—না, লাগে নি আবার—সত্যিই কেঁদে ফেলল ভবানী।

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, এর শোধ আমি নেব। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

প্ল্যানটা যে কি বলা হল না ফুচকার। কারণ সে হঠাৎ দেখতে পেল রায়কত্তা এসেই কাছে টেনে নিলেন ঝুনুকে। বললেন, 'কিছু মনে করিস নে মা। রাগের মাথায় তোকে মেরে বসেছি। তাই গুরুদেব খুব বকেছেন আমাকে। চল্ মা চল, রাগ করিসনে। তোর জন্য ভিখিরীদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন গুরুদেব।'

পণ্ডিত মশাই বললেন, 'কেউ তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলে তাকে ক্ষমা করতে হয়।' চল্‌রে—তোরা সবাই চল। গুরুদেব তোদের সবাইকে ডেকেছেন। হরি, তুমিও চল।'

ভবানীর ইচ্ছে ছিল না ঝুনুকে আর রায়কত্তার বাড়িতে পাঠায়। কিন্তু হরি যাচ্ছে শুনে বাধা দিল না সে।

ওরা রায় বাড়িতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এলেন কিম্ভূতানন্দ। কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ঝুনুর দিকে। তারপর

হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'এ যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। ওরে তোরা কে আছিস সব বের করে নিয়ে আয়। মায়ের যত ইচ্ছে সব বিলিয়ে দিক।

কিম্ভূতানন্দের কথায় প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল ঝুনু। তারপর খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল সে। বারকোষ শূন্য করে মিষ্টি, ফলমূল দিল ভিখারীদের।

এরপর কিম্ভূতানন্দ নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন হিতকারী সংঘের সদস্যদের।

ওদের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ঝুনুকে বললেন, 'মা, তোর এই বুড়ো ছেলেটার যে খিদে পেয়েছে, একটু খাইয়ে দিবি ?

ঝুনু বলল, 'দেব'।

ঝুনু নিজে হাতে খাইয়ে দিল কিম্ভূতানন্দকে।

খাওয়া শেষে কিম্ভূতানন্দ বললেন, 'আমি অন্নপূর্ণা মায়ের হাতে খেতে পেয়ে ধন্য হলুম আজ। সার্থক হল আমার মানব জন্ম।'

এই ঘটনার পর সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল ঝুনুর নাম। রায়কত্তা হিতকারী সংঘের জন্য ছেড়ে দিতে চাইলেন বাইরের ঘরখানা।

ঘরখানা নেবে কি নেবে না ভেবে দোটানায় পড়ল সংঘের সভ্যরা। কারণ রায়কত্তা যদি আবার হঠাৎ রেগে গিয়ে কিছু করে বসেন।

কয়েকদিন ভাবনা চিন্তার পর লালটুই একদিন ভোটাভুটির প্রস্তাব করল।

কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে ভোট হয়ে গেল একদিন। এবং অবাক হয়ে ওরা দেখল রায়কত্তার ঘরখানাকে নেওয়ার জন্যই কাগজে লিখে দিয়েছে সকলে।

শান্টু বলল, 'আমরা কিন্তু ওমনিই গিয়ে ঘরে ঢুকব না। পার্কটা সকলের জন্য খুলে দেবার দিন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান যেমন

ফিতে কেটেছিলেন তেমনি ফিতে কাটা হবে। আর সেই ফিতে কাটবে ঝুনু। কারণ ঝুনুর জন্যই এমন সুন্দর একখানা ঘর পাওয়া গেল। সবাই রাজী?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

এবার হেবো বলল, 'আমি ভাবছি সেদিন একটা সভা করে হিতকারী সংঘের উদ্দেশ্য সবাইকে বুঝিয়ে বললে কেমন হয়?'

ফ্যালা বলল, 'কিন্তু কে বলবে?'

ল্যাঠা বলল, 'লা-লা-লালটু। সংঘের লি-লি-লীডার।'

ফুচকা বলল, 'ধ্যুৎ কালা, খুব ভাল হয় তাহলে। কি রে লালটু বলতে পারবি তো?'

লালটু একটু ভেবে বলল, 'পারব। তবে আগে থেকে লিখে পণ্ডিতমশায়কে দিয়ে কারেক্‌শন্ করিয়ে নিতে হবে।'

শান্টু বলল, 'সেই ভাল।'

সবশেষে ঝুনু বলল, 'সভাশেষে গান বাজনা হলে কেমন হয়?'

ল্যাঠা হাততালি দিয়ে বলল, 'দা-দা-দারুণ।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়।

হরি বাউল পঞ্জিকা দেখে শুভ দিনক্ষণ স্থির করে দিল—দু'জন ভাল গাইয়েকেও গান গাইবার জন্য বলল সে।

হেবোর হাতের লেখা ভাল।

সে তিনদিন খেটে টিনের ওপর রঙ দিয়ে লিখল 'হিতকারী সংঘের কার্যালয়।'

ফুচকা, ল্যাঠা, ফ্যালা কয়েকটা পুরোনো ক্যালেণ্ডার থেকে ফটো জোগাড় করল। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ফটো। সেই ফটোগুলো পিচবোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে সাঁটা হল ঘরে টাঙানো হবে বলে।

লালটু দু'দিন চেষ্টা করে অনেকগুলো কাগজ ছিঁড়ে তার বক্তব্য লিখল। তারপর সকলে মিলে গেল পণ্ডিতমশায়ের কাছে।

পড়লেন পণ্ডিতমশাই। সংশোধন করে দিয়ে বললেন, 'তোদের সংঘের মূল উদ্দেশ্য "মানুষের সেবা" এই তো? তা হ্যাঁরে, তোরা সত্যিই এই ব্রত চিরকাল পালন করবি তো?'

লালটু বলল, 'আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন স্যার।' এই কথা বলে পণ্ডিতমশায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সে।

ওর দেখাদেখি প্রণাম করল সকলেই।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আমি মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর করুণা যেন তোদের সকলের ওপর বর্ষিত হয়। আর এই হিতকারী সংঘ নামে চারাগাছটি যেন একদিন সুনাম নিয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে শাণ্টু বলল, 'ওইদিন পণ্ডিতমশায়কে বলতে বললে হয় না?'

লালটু বলল, 'আমিও তাই ভাবছি ওঁকে বলতে বলব।'

সবকিছু রেডি।

রবিবার বিকেল পাঁচটায় কার্যালয় উদ্বোধন।

শনিবার হিতকারী সংঘের সদস্যদের মনে খুশির উত্তেজনা।

স্কুল থেকে ফিরে সংঘের ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে ফেলল ওরা। তারপর এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে সকলকে তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বলে এল।

রাত পোহালেই সেই শুভদিন।

রাত পোহাল।

বেলা বাড়তে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল তাড়া খাওয়া হরিণ শিশুর মতো ছুটে চলেছে ভীত সন্ত্রস্ত ফ্যালা।

ছুটতে ছুটতে প্রথমে লালটুর বাড়ি তারপর শাণ্টু, হেবো, ল্যাঠা, ফুচকার বাড়ি হয়ে ছুটতে লাগল সে। পথে গদাধর মোক্তার আর

পণ্ডিতমশায়ের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে কটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে আবার ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে হরি বাউলের বাড়িতে যখন পৌঁছুলো সে তখন লোকে লোকারণ্য।

ঝুনুর কাকা-কাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন উঠোনে। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থানা অফিসার এবং দু'জন পুলিশ কনেস্টবল।

হরি বাউলের অতি পরিচিত থানা অফিসার ভর্ৎসনা করলেন বাউলকে। বললেন,—'একটা অচেনা মেয়ে তোমার বাড়িতে এসে উঠেছে এ খবরটা থানায় জানিয়ে আসা উচিৎ ছিল তোমার।'

ঝুনুর কাকা বললেন, 'আমার মনে পড়ছে দিন দুই এই বাউলভাই আমার বাড়িতে গিয়েছিল গান গাইতে। কিন্তু কিছুই বলে নি আমাদের।'

হরি বলল, 'হ্যাঁ বড়বাবু, আমি ঝুনুর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে গিয়েছিলুম ওঁদের বাড়িতে। ভেবেছিলুম সব বলব ওঁদের। কিন্তু বলব বলব করেও বলতে পারি নি।

—কেন ? প্রশ্ন করলেন থানা অফিসার।

—বলতে পারি নি ভয়ে। যদি ঝুনুকে ফিরিয়ে নিয়ে যান ওঁরা ; ঝুনু যে আমাদের প্রাণ—

ঝুনুর কাকী বললেন, 'আহা, কী কথাই শোনালেন। উনি এখানে আটকে রেখেছেন মেয়েটাকে আর লোকে নিন্দে করছে আমাদের। বলছে বাপ-মা-মরা মেয়েটাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো দারোগাবাবু।'

থানা অফিসার বললেন, 'মেয়েটা যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে আর লোকেও যখন নিন্দে করছে আপনাদের তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে বিশেষ কারণ আছে। যাক সে কথা—আমি ওসবের মধ্যে যেতে চাই না। আপনারা মেয়ে ফিরে পেয়েছেন এটাই যথেষ্ট ; এখন ওকে বাড়ি নিয়ে যাবেন তো ?'

ঝুনুর কাকী বললেন, 'আঁজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি নিয়ে যাব।'

ঝুনু বলল, 'আমি যাব না, আমি যাব না। আমি এখানে বাবা-মায়ের কাছে থাকব।'

ভবানীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল সে।

কোনো কথা নেই ভবানীর মুখে। তার অন্ধ চোখ দু'টি থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে হরির দু'গণ্ড বেয়েও। আর অশ্রু টলমল করছে লালটু-শান্টু-ফ্যালা-ল্যাঠা-হেবো-ফুচকার চোখে।



পণ্ডিতমশাই এবং গদাধর মোক্তার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এক পাশে। এবার ঝুনুর কাকা-কাকীর সামনে এগিয়ে গেলেন তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আপনাদের পরিবারের মেয়ে ঝুনু, স্বাভাবিকভাবে ওর ওপর আপনাদেরই অধিকার। তবু বলি স্নেহ-ভালবাসার একটা পৃথক মূল্য আছে। পৃথক মূল্য আছে হৃদয়ের টানের। তাই বলছি ওকে এখানেই থাকতে দিন।'

একটু একটু করে এগিয়ে গেল লালটু। তার পেছন পেছন

হিতকারী সংঘের অন্য সকলে। ওদের হয়ে লালটু বলল, 'আপনারা আমাদের বোনকে কেড়ে নেবেন না—'কান্নার জোয়ারে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল লালটুর।

ঝুনুর কাকা তাঁর স্ত্রীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন।

এবার ঝুনুর কাকী বললেন, 'বেশ, তাই হোক। সবাই যখন বলছে আর ঝুনুও যখন তার নতুন বাপ-মায়ের কাছে থাকতে চাইছে—'

ঝুনুর কাকীর কথা শেষ হল কি হল না গদাধর মোক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে ঝুনু, তোর কাকা-কাকীকে প্রণাম কররে, প্রণাম কর।'

উঠে এলো ঝুনু। কাকা-কাকীকে প্রণাম করল।

ওর কান্না ভেজা মুখখানায় তখন হাসি ফুটেছে। হাসি ফুটেছে উপস্থিত সকলের মুখেই।

---